বাংলা বিজ্ঞান কথা

Vol. III | Issue 9–10 | Sep-Oct 2025| Rs. 80

উৎসব সংখ্যা ২০২৫

RAMAKRISHNA MISSION

সূচীপত্র

ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক সচেতনতার প্রদীপ জ্বালানো — ৫

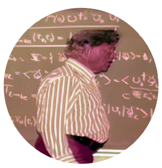
কোয়ান্টাম রসায়নের জনক পের-ওলভ লোউডিন — ৮
জাহিদ এইচ খান

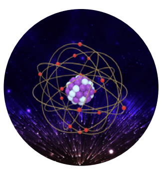
কোয়ান্টাম রসায়ন—অণুর অদৃশ্য জগতের খোঁজ — ১২
অমিতেশ ব্যানার্জী

রামানুজন সংখ্যা 1729—জানা সংখ্যার কিছু অজানা কথা — ১৬
ভূপতি চক্রবর্তী

প্লাস্টিক দূষণ থেকে পরিত্রাণের খোঁজে — ২২
দীপাঞ্জন ঘোষ

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, না কি বিজ্ঞান-সাহিত্যিক? — ২৮
সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

ছড়ায় ছয় ঋতু — ৩১
সঞ্চালী রায়

অ্যানিউরিজম পরবর্তী আংশিক ঢেকে যাওয়া বৃক্ক বা রেনাল ধমনীর প্রবাহগত ঘটনা — ৩২
ধূর্জটি প্রাসাদ চক্রবর্তী

সৌরজগতের সৃষ্টি কাহিনী — ৩৪
সিদ্ধার্থ রায়

105তম জন্মবার্ষিকীতে কল্পবিজ্ঞান কিংবদন্তি রে ব্র্যাডবেরি — ৩৮
সৌভিক চক্রবর্তী

জীবন্ত-শিল্প — ৪২
অরুনিমা ভৌমিক

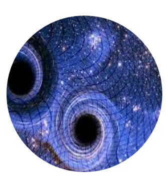
মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিষ্কারের ইতিহাস — ৪৪
অসিত চক্রবর্তী

সাপ সম্বন্ধে কিছু কথা — ৪৯
সৌরভ সোম

বাংলা
বিজ্ঞান কথা
Sep-Oct 2024 | Vol. III | Issue 9-10

সম্পাদকীয়

আলো ও কোয়ান্টামের উত্তরাধিকার — উৎসবের উদ্দীপনা

শুভ শারদীয়া! **বাংলা বিজ্ঞান কথা**-র পক্ষ থেকে সকল পাঠককে জানাই আন্তরিক শারদ শুভেচ্ছা—আসন্ন বছরে আপনাদের জীবন সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্যে ভরে উঠুক।

অধ্যাপক জাহিদ হুসেন খান এক অনন্য প্রতিভাধর পদার্থবিজ্ঞানী—চার দশকেরও বেশ কিছু আগে তিনি শুধু যে আমাকে অপটিক্স, স্পেকট্রোস্কপি ও লেজারের সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করিয়েছিলেন তা-ই নয়, বরং সীমান্ত ও প্রজন্ম পেরিয়ে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে তাঁর অনমনীয় অঙ্গীকারের জন্যও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই। কেবল পদার্থবিজ্ঞানের উপর তাঁর দখল নয়, বরং আলো ও কোয়ান্টাম প্রযুক্তির মতো বিজ্ঞানের জটিল ক্ষেত্রগুলিকে সর্বজনীন করে তোলার অবিরাম সাধনা তাঁকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে তোলে।

বহু বছর ধরে অধ্যাপক খান বিজ্ঞান-প্রচার কার্যক্রমের সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন; ‘ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ লাইট’-এর মতো উদ্যোগ তিনি অনন্য ধারাবাহিকতায় এগিয়ে নিয়েছেন। লজিস্টিক, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক—বিভিন্ন বাধা সত্ত্বেও জনসাধারণের সঙ্গে বিজ্ঞানের সেতুবন্ধনে তাঁর অবদান কখনও টলে যায়নি। প্রাঞ্জল বক্তৃতা, মননশীল রচনা ও তৃণমূল পর্যায়ের কাজের মাধ্যমে তিনি ছাত্র–শিক্ষক–সাধারণ পাঠক সবার কৌতূহল জাগিয়েছেন, বোঝাপড়া গভীর করেছেন।

সম্প্রতি বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ও ‘ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ লাইট’ স্টিয়ারিং কমিটির চেয়ার প্রফেসর জন ডাডলির সঙ্গে যৌথভাবে অধ্যাপক খান কোয়ান্টাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে এক চিন্তাপ্রসূত সেমিনারের আয়োজন করেন। ওই অনুষ্ঠানটির প্রতিবেদন আমরা আমাদের **বাংলা বিজ্ঞান কথা**-র জুলাই সংখ্যায় তুলে ধরেছিলাম, এবং পাঠকদের কাছ থেকে উষ্ণ সাড়া পেয়েছি।

তাতেই শেষ নয়। ‘ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ কোয়ান্টাম সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি’কে সামনে রেখে, সাধারণ পাঠকের নাগালে কোয়ান্টামের জটিল ধারণা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আমরা অধ্যাপক খানকে বাংলা বিজ্ঞান কথা-র জন্য ধারাবাহিক নিবন্ধ লেখার অনুরোধ জানাই। স্বভাবতই তিনি আন্তরিক সম্মতি দেন। তখনই তিনি স্মরণ করেন কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির প্রখ্যাত স্থপতি অধ্যাপক পের-ওলভ লোউডিনের সঙ্গে তাঁর গঠনমূলক যোগাযোগের দিনগুলো। ফলাফল—এক আবেগঘন ও বৌদ্ধিকভাবে সমৃদ্ধ স্মৃতিচারণ, যেখানে ধরা পড়ে কেবল লোউডিনের মেধা নয়, বরং এমন এক দীর্ঘস্থায়ী মেন্টরশিপের ছায়া যা অধ্যাপক খানের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক যাত্রাকেও গড়ে দিয়েছে।

এই উৎসব সংখ্যায় আমরা লোউডিনের সম্পর্কে নিবন্ধ প্রকাশ করতে পেরে গর্বিত—কোয়ান্টাম আবিষ্কারের এক সোনালি যুগের অন্তরঙ্গ ঝলক, যা কেবল সত্যিকারের বিজ্ঞানের শিষ্যই এমন উষ্ণতা ও স্বচ্ছতায় লিখতে পারেন। উৎসবকে সামনে রেখে এই সংখ্যায় রয়েছে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা ও বিশেষভাবে নির্বাচিত নিবন্ধসমূহ—আলো, শব্দ, উপকরণ ও দৈনন্দিন বিজ্ঞানের নানা আঙ্গিক, যা উৎসবের সৃজনশীলতা ও নবায়নের চেতনার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

সম্পাদকের দৃষ্টিতে, এই সংখ্যাটি অতীত ও ভবিষ্যৎ, স্মৃতি ও গতি, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলে। বিজ্ঞানী, ছাত্র, শিক্ষক ও কৌতূহলী পাঠকদের আমরা আমন্ত্রণ জানাই—পড়ুন, ভাবুন, ছড়িয়ে দিন। এই সংখ্যাটি শুধু সংগ্রহে জমা না হয়ে, হয়ে উঠুক অনুঘটক।

বাংলা বিজ্ঞান কথা যদি সত্যিই ভারতের বৈজ্ঞানিক স্বপ্ন ও বৈশ্বিক সহযোগিতার কণ্ঠস্বর হয়ে উঠতে চায়, তবে এমন নিবন্ধের মাধ্যমেই তা সম্ভব—যা ভাষা, অঞ্চল ও প্রজন্মের সীমানা পেরিয়ে অনুরণিত হয়। এই বার্তাটি ছড়িয়ে দিতে আমাদের সহায়তা করুন। আপনার পরিচিত মহলে এই উৎসব সংখ্যাটি পাঠান, পরিচিতদের সুপারিশ করুন; বিজ্ঞান পৌঁছে যাক প্রতিটি দোরগোড়ায়—বাংলায়, সারা ভারতে, আর বিশ্বজুড়ে।

ডঃ নকুল পারাশর

উপদেষ্টামণ্ডলী
স্বামী কমলাস্থানন্দ
প্রোঃ বিমল রায়
প্রোঃ অনুপম বসু
ডঃ সুমিত্রা চৌধুরী
ডঃ শুভব্রত রায়চৌধুরী

মুখ্য সম্পাদক
ডঃ নকুল পারাশর

সম্পাদকমণ্ডলী
ডঃ ভূপতি চক্রবর্তী
প্রোঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার
প্রোঃ শঙ্করাশিস মুখার্জি
অমিতেশ ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118
শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি 17, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী 110060

ফোন
+91 11 4036 5723

ইমেল
info@shantifoundation.global

ওয়েবসাইট
www.shantifoundation.global

‘বাংলা বিজ্ঞান কথা’য় প্রকাশিত প্রবন্ধ, মতামত বা লেখকের ব্যবহৃত চিত্রের বিষয়ে প্রকাশকের কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না।

‘বাংলা বিজ্ঞান কথা’য় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কেবলমাত্র বিনামূল্যে বিতরিত কোনো মুদ্রণ মাধ্যমেই প্রকাশকের অগ্রিম অনুমতির ভিত্তিতে উপযুক্ত সূত্রমূলের উল্লেখসাপেক্ষে পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

প্রকাশক
রামকৃষ্ণ মিশন
বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ
রহড়া, কলকাতা 700118
এবং
শান্তি ফাউন্ডেশন
ইউ জি ১৭, জ্যোতি শিখর
ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, জনকপুরী
নয়া দিল্লী ১১০০৬০

2024
বাংলা বিজ্ঞান কথা
Vol. II | Issue 1
জানুয়ারী ২০২৪
এক'শ বছরে পা রাখলো বোস সংখ্যায়ন
শিক্ষা ও বিজ্ঞান ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা
জলাভূমি জলাশয় নিয়ে কিছু কথা
প্রকৃতিতে বস্তুতের রকম-সকম
যারা আলো জ্বেলেছিল
ঘরে ঘরে রসায়ন
Shanti Foundation

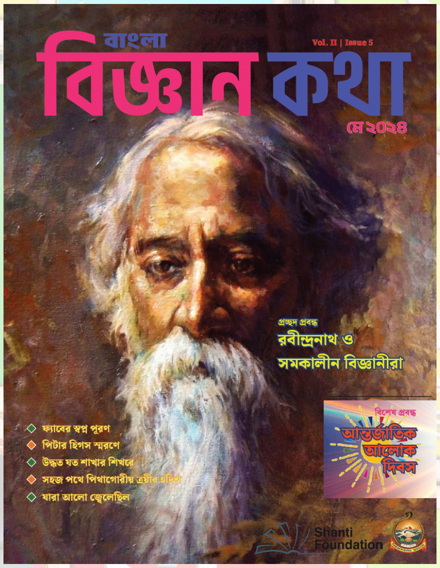
বাংলা বিজ্ঞান কথা
Vol. II | Issue 5
মে ২০২৪
প্রচ্ছদ প্রবন্ধ
রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন বিজ্ঞানীরা
বিশেষ প্রবন্ধ
আন্তর্জাতিক আলোক দিবস
ফ্যাবের স্বপ্ন পূরণ
পিটার হিগস স্মরণে
উদ্ভত মত শাখার শিখরে
সহজ পথে পিথাগোরীয় ত্রয়ীর ছবি
যারা আলো জ্বেলেছিল
Shanti Foundation

বাংলা বিজ্ঞান কথা
Vol. I | Issue 3
নভেম্বর ২০২৩
টিকার নেপথ্যের মৌলিক গবেষণা পেল নোবেল স্বীকৃতি
ম্যাক্সওয়েল ও তড়িৎচুম্বকত্ব
যারা আলো জ্বেলেছিল
পিথাগোরীয় ত্রয়ীদের মধ্যে কিছু বিন্যাসের সন্ধান
Shanti Foundation

বাংলা বিজ্ঞান কথা
Vol. II | Issue 4
এপ্রিল ২০২৪
শুভ নববর্ষ
ক্ষনিকের ঝলক
বসন্ত বৌরি
Shanti Foundation

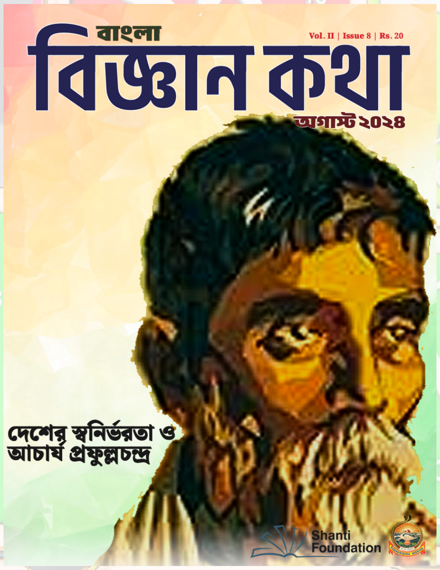
বাংলা বিজ্ঞান কথা
Vol. II | Issue 8 | Rs. 20
অগাস্ট ২০২৪
দেশের স্বনির্ভরতা ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র
Shanti Foundation

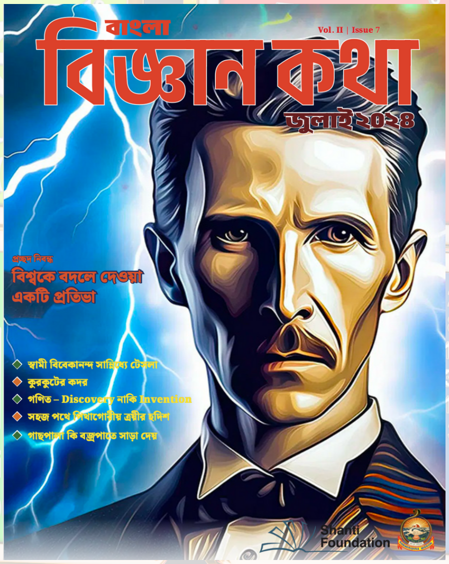
বাংলা বিজ্ঞান কথা
Vol. II | Issue 7
জুলাই ২০২৪
বিশ্বকে বদলে দেওয়া একটি প্রতিভা
স্বামী বিবেকানন্দ সান্নিধ্যে টেসলা
কুকুটের কদর
সহজ পথে পিথাগোরীয় ত্রয়ীর ছবি
Shanti Foundation

বাংলা বিজ্ঞান কথা
Vol. II | Issue 2
ফেব্রুয়ারী ২০২৪
রামন এফেক্ট আবিষ্কারের দিনগুলি
ভারতীয় পরীক্ষাগারের জনক
অথ মিসিসিপি কথা
রূপে তোমায় ভোলাব না
যারা আলো জ্বেলেছিল
প্রসঙ্গ জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস
Shanti Foundation

বাংলা বিজ্ঞান কথা
Vol. II | Issue 11 | Rs. 20
নভেম্বর ২০২৪
নোবেল পুরস্কার 2024
রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়
আই এ পি টি চল্লিশ বছরের পথচলা পূর্ণ করলো
সবুজ শক্তি
কেমিক্যাল লোচার নেপথ্যে
Shanti Foundation

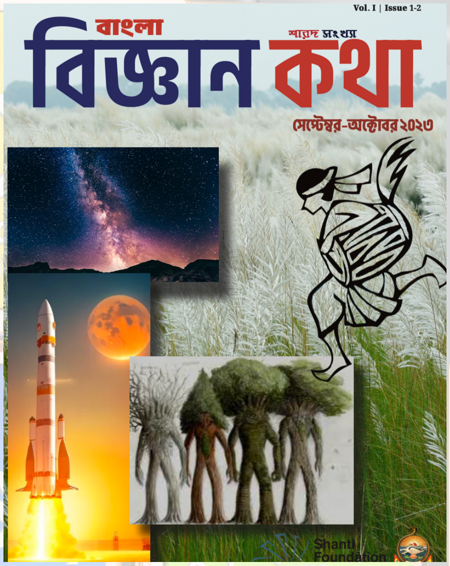
Vol. I | Issue 1-2
বাংলা বিজ্ঞান কথা
শারদ সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৩
Shanti Foundation

ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক সচেতনতার প্রদীপ জ্বালানো

SCoPE (Science Communication Popularization & its Extension) শক্তিশালী করার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার

বিজ্ঞান কেবল একটি অধ্যন বা গবেষণার বিষয় নয়—এটি হলো একটি সংস্কৃতি। এটি আমাদের শেখায় কৌতূহলী হতে, প্রশ্ন করতে, উত্তর খুঁজতে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তি ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু বিজ্ঞান তখনই সমাজের সত্যিকারের সম্পদ হয়ে ওঠে, যখন তা মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে যায়।

ভারতের মতো ভাষাবহুল দেশে বৈজ্ঞানিক তথ্য যদি কেবল ইংরেজিতে সীমাবদ্ধ থাকে, তবে তা সমাজের খুব ছোট একটি অংশেই পৌঁছায়। এ কারণেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বিজ্ঞানকে মাতৃভাষায় পৌঁছে দেওয়াই বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর, শূন্যতার সৃষ্টি

একসময় বাংলায়, হিন্দিতে, মারাঠিতে, তামিলে, মালয়ালমে ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় একাধিক জনপ্রিয় বিজ্ঞানপত্রিকা প্রকাশিত হতো। এগুলোই ছিল পাঠক ও গবেষক, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের মধ্যে সেতুবন্ধন। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে একে একে প্রায় কুড়িটি আঞ্চলিক বিজ্ঞানপত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, কোথাও অর্থের অভাব; কোথাও লেখকের সংকট; কোথাও নতুন প্রজন্মের পাঠকের সঙ্গে সংযোগের ঘাটতি। এই শূন্যতা শুধু প্রকাশনা জগতে নয়, সমাজের মধ্যে এক ধরনের বৈজ্ঞানিক নীরবতা তৈরি করেছিল। তখনই আমাদের মনে হলো—এই প্রদীপ আবার জ্বালাতে হবে।

SCoPE: একটি নতুন দিশা

আমরা শুরু করি SCoPE (Science Communication Popularization & its Extension)—একটি আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য বিজ্ঞানকে আবারও মানুষের ভাষায়, মানুষের জীবনে ফিরিয়ে আনা। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে আমরা তিনটি মূল পদক্ষেপ নিয়েছি:

বাংলা বিজ্ঞান কথা

2023 সালে শুরু হওয়া এই পত্রিকা আজ পৌঁছে গেছে 25তম সংখ্যায়। এর পাতায় বৈজ্ঞানিক খবর, সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ, গল্প আকারে জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা—সবই একত্রে পরিবেশিত হয়। পাঠকের চিঠি ও প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করেছে যে বিজ্ঞানকে বাংলায় পড়তে মানুষ সত্যিই আগ্রহী।

বিজ্ঞান 2047

ভারতের স্বাধীনতার 100 বছর পূর্তি উপলক্ষে **বিজ্ঞান 2047** এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হাজির হয়েছে। অতীতের বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব, বর্তমানের গবেষণা এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ—সব মিলিয়ে এটি এক সেতুবন্ধন। এখন এটি তার প্রথম বর্ষপূর্তি সংখ্যা উদযাপন করছে।

অ্যারিভিয়াল পালাগাই (Ariviyal Palagai)

দক্ষিণ ভারতের পাঠকের জন্য তামিল ভাষায় এই পত্রিকাকে আমরা সমর্থন দিয়ে চলেছি। এটি প্রমাণ করে যে বিজ্ঞান ভাষার গণ্ডি ছাড়িয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হয়।

চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি

আমাদের যাত্রা মোটেই মসৃণ ছিল না। প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল সংগ্রামে ভরা।

অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ: বিজ্ঞানপত্রিকাগুলি মূলত অলাভজনক; এগুলি ভালোবাসার শ্রমে টিকে থাকে।

ভাষাগত জটিলতা: বৈজ্ঞানিক শব্দ বাংলায় বা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা সহজ নয়। সঠিক প্রতিশব্দ বেছে নেওয়া ও একইসঙ্গে পাঠকের কাছে বোধগম্য করে তোলা ছিল এক বড় কাজ।

ডিজিটাল প্রতিযোগিতা: আজকের যুগে সামাজিক মাধ্যম ভাসমান তথ্য দিয়ে ভরে গেছে যা অনেকাংশেই ভুল তথ্য। গভীর ও নির্ভরযোগ্য লেখা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া ছিল কঠিন।

স্বীকৃতি ও স্থায়িত্ব: ISSN নম্বর পাওয়া আমাদের জন্য ছিল এক বড় পদক্ষেপ—যা আন্তর্জাতিক মানের স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।

তবুও প্রতিটি চ্যালেঞ্জ আমাদের নতুন শিক্ষা দিয়েছে, নতুন শক্তি দিয়েছে।

এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা

এই পথচলা কেবল আমাদের নয়। এটি একটি সমষ্টিগত প্রয়াস। লেখকরা তাদের সময় ও শ্রম দিয়ে আমাদের পাশে থেকেছেন। পাঠকেরা চিঠি, মতামত ও উৎসাহ দিয়ে প্রতিটি সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সম্পাদক ও ডিজাইনাররা নেপথ্যে থেকে অবিরাম কাজ করেছেন। তাদের প্রত্যেককে আমাদের কৃতজ্ঞতা।

উৎসবের আলো ও জ্ঞানের প্রদীপ

এই বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ পাচ্ছে এমন সময়ে, যখন গোটা দেশ শারদীয়া, দশেরা ও দীপাবলি উদযাপন করছে। বিজয়া দশমী আমাদের শেখায় সত্যের জয়, দীপাবলি আমাদের শেখায় দিকে দিকে জ্ঞানের দীপ জ্বালানো। আমাদের পত্রিকাগুলিও একই বার্তা বহন করে—অজ্ঞতার অন্ধকার ভেদ করে জ্ঞানের আলো ছড়ানো।

সামনে পথ: আরও প্রসার, আরও সংযোগ

আমাদের স্বপ্ন—

- প্রতিটি ভারতীয় ভাষায় একটি করে শক্তিশালী বিজ্ঞানপত্রিকা থাকবে।
- প্রিন্ট, রেডিও, টিভি, সোশ্যাল মিডিয়া—সব জায়গায় বিজ্ঞান আলো ছড়াবে।
- বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পত্রিকাগুলি হবে শিক্ষার সহায়ক হাতিয়ার।
- তরুণ প্রজন্ম নিজের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান পড়ে অনুপ্রাণিত হবে।

পাঠকের প্রতি আহ্বান

আমরা আহ্বান জানাই—

- তরুণ লেখকদের, মাতৃভাষায় বিজ্ঞান লেখা শুরু করার জন্য।
- শিক্ষকদের, পাঠ্যক্রমের অংশ হিসেবে এগুলি ব্যবহার করার জন্য।
- সংস্থা ও কর্পোরেটদের, এই মহৎ কাজে সহযোগিতা করার জন্য।

উপসংহার

যেখানে কুড়িটি পত্রিকা বন্ধ হয়ে সমাজে নীরবতা নেমে এসেছিল, সেখানে আজ বাংলা বিজ্ঞান কথা, বিজ্ঞান 2047 এবং Ariviyal Palagai এক নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে।

আমরা জানি পথ কঠিন, কিন্তু রোমাঞ্চকর। অনেক কিছু শেখার আছে, করার আছে। লেখকদের আশীর্বাদ, পাঠকদের ভালোবাসা এবং সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি—প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি ভাষায় বিজ্ঞানের আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

শুভ বিজয়া ও দীপাবলি

জ্ঞানের আলো আমাদের সকলের জীবন আলোকিত করুক, কৌতূহল আমাদের পথ দেখাক, আর বিজ্ঞান আমাদের শক্তি জোগাক।

VIGYAN 2047
Vol. 1 | Issue 1 | Oct 2024 Rs 20
International Year of Quantum Science & Technology
Palliative Care
Inaugural Issue
RKMVCC
50 YEARS & COUNTING

VIGYAN 2047
Vol. 1 | Issue 2 | Nov 2024 Rs 20
The Exciting world of Quantum Science
Data Science
Autism Spectrum Disorder
Nobel 2024
AI enabled this time

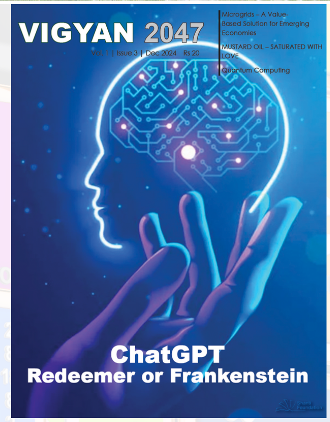
VIGYAN 2047
Quantum Computing
ChatGPT
Redeemer or Frankenstein

VIGYAN 2047
Quantum Electronics
Palliative Care
Vivekananda & Science
DEVELOPED INDIA MISSION
University
Global
Rankings

VIGYAN 2047
Quantum Computing
Palliative Team
Soft Skills for Science Communication
Runaway Cyclone
DEVELOPED INDIA MISSION
Nutrition and
Health in the Indian
Subcontinent

VIGYAN 2047
DEVELOPED INDIA MISSION
Satyajit Ray's SciFi
Dark Matter
QUANTUM
INTERNET
Futuristic Communication

VIGYAN 2047
Vol. 2 | Issue 4 | Apr 2025 Rs 50
DEVELOPED INDIA MISSION
Aging Gracefully
IYQST – Quinnie
Science Communicators
Palliative Care
My Friend Robbi
STEM EDUCATION
Which way?
Shanti Foundation

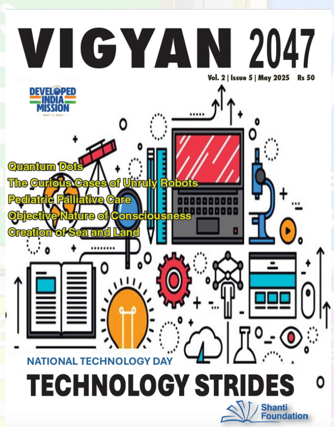
VIGYAN 2047
Vol. 2 | Issue 5 | May 2025 Rs 50
DEVELOPED INDIA MISSION
Quantum Dots
The Curious Cases of Unruly Robots
Pediatric Palliative Care
Objective Nature of Consciousness
Creation of Sea and Land
NATIONAL TECHNOLOGY DAY
TECHNOLOGY STRIDES
Shanti Foundation

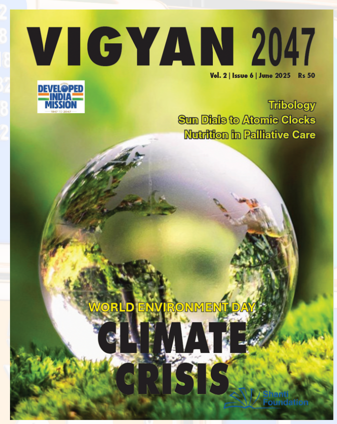
VIGYAN 2047
Vol. 2 | Issue 6 | June 2025 Rs 50
DEVELOPED INDIA MISSION
Tribology
Sun Dials to Atomic Clocks
Nutrition in Palliative Care
WORLD ENVIRONMENT DAY
CLIMATE
CRISIS

VIGYAN 2047
DEVELOPED INDIA MISSION
The Evolution of Tribology
Weaving Science Into Your Wardrobe
Hospice Project in Palliative Care
BIOTECHNOLOGY
A Window into Life's Toolkit
Shanti Foundation

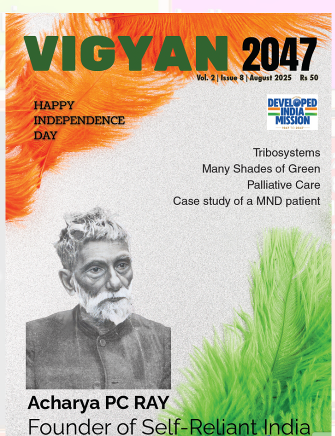
VIGYAN 2047
Vol. 2 | Issue 8 | August 2025 Rs 50
HAPPY INDEPENDENCE DAY
DEVELOPED INDIA MISSION
Tribosystems
Many Shades of Green
Palliative Care
Case study of a MND patient
Acharya PC RAY
Founder of Self-Reliant India

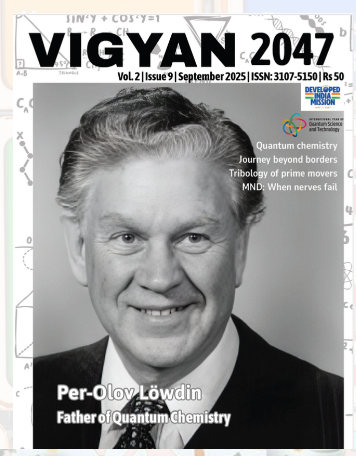
VIGYAN 2047
Vol. 2 | Issue 9 | September 2025 | ISSN: 3107-5150 | Rs 50
DEVELOPED INDIA MISSION
Quantum chemistry
Journey beyond borders
Tribology of prime movers
MND: When nerves fail
Per-Olov Löwdin
Father of Quantum Chemistry

কোয়ান্টাম রসায়নের জনক পের-ওলভ লোউডিন

জাহিদ এইচ খান

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান মেধার বিশাল নক্ষত্রপুঞ্জে পের-ওলভ স্বীয় প্রতিভায় চির উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব যার দৃষ্টিভঙ্গি কোয়ান্টাম রসায়নকে তাত্ত্বিক কৌতূহল থেকে বাস্তবে আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত শাখায় রূপান্তরিত করেছিল। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান পদার্থবিদ, একজন দক্ষ শিক্ষক, প্রতিষ্ঠানের সংগঠক এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক ভ্রাতৃত্ববোধের একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। লোউডিনের জীবন বৌদ্ধিক প্রতিভা, বৈজ্ঞানিক দৃঢ়তা এবং দার্শনিক গভীরতার দ্বারা সম্পৃক্ত ছিল।

1916 সালের 28শে অক্টোবর সুইডেনের উপসালায় জন্মগ্রহণকারী পের-ওলভ লোউডিন শৈশবেই তার প্রতিভার প্রাথমিক পরিচয় রাখেন। উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ ছাত্র হিসাবে তিনি তার অসাধারণ গাণিতিক দক্ষতার জন্য পরিচিতি লাভ করেন এবং দ্রুত অনুষদ এবং সহকর্মীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ ইভার ওয়ালারের নির্দেশনায় তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রস্ফুটিত হয় এবং 1948 সালে লোউডিন আয়নিক স্ফটিকের সমন্বিত শক্তি এবং স্থিতিস্থাপক ধ্রুবকের উপর যুগান্তকারী কাজ করে পিএইচডি অর্জন করেন। এই গবেষণাটি কেবল এর প্রযুক্তিগত দক্ষতা নয় বরং এর বাস্তবায়নের সাহসিকতার জন্যই এত অসাধারণ হয়ে উঠেছিল— মনে রাখতে হবে গবেষণাটি হয়েছিল ডিজিটাল কম্পিউটার আবিষ্কারের আগের যুগে।

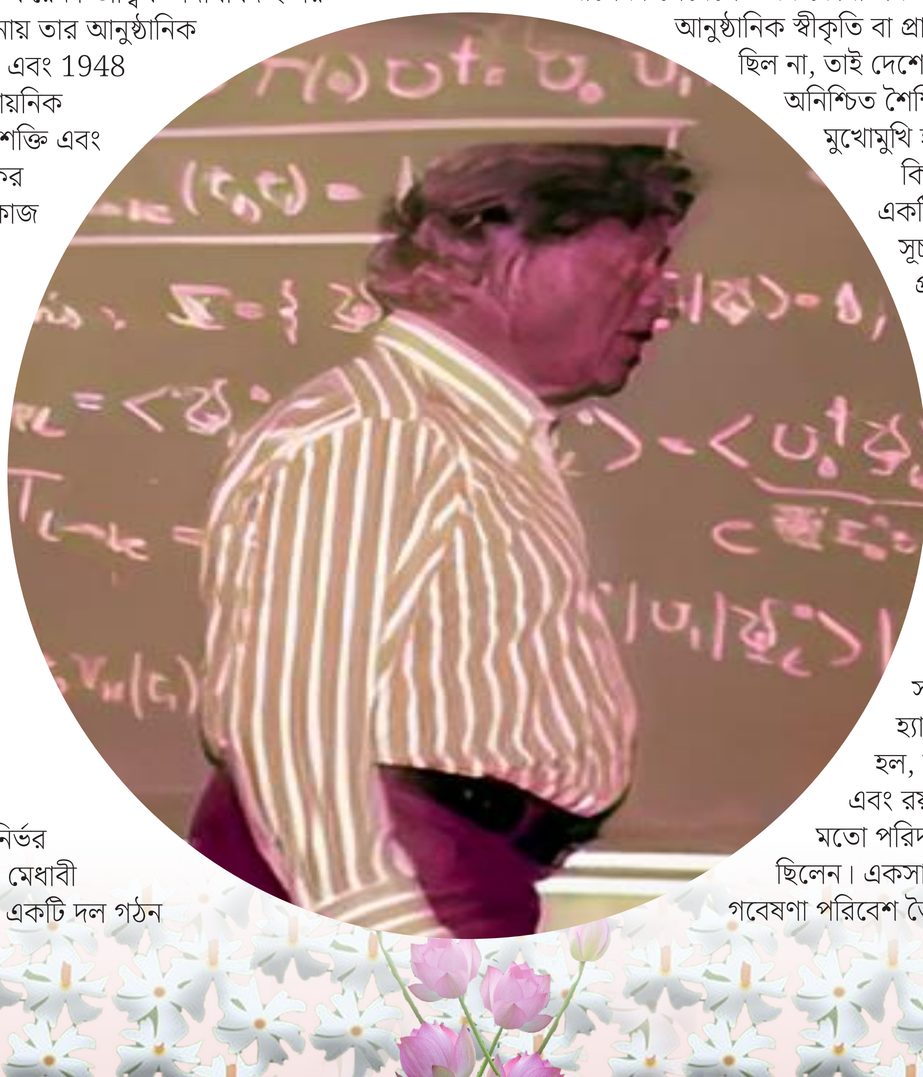

যন্ত্রের উপর নির্ভর না করে, লোউডিন মেধাবী বিজ্ঞানের ছাত্রদের একটি দল গঠন করেন কাজ করার হাতিয়ার ছিল শুধুমাত্র বৈদ্যুতিকভাবে চালিত ক্যালকুলেটর এবং উদ্ভাবনী সংখ্যাসূচক অ্যালগরিদম। মননশীল গণনার এই সহযোগিতামূলক কৃতিত্বে লোউডিন পদার্থের ভৌত বৈশিষ্ট্য বোঝার ক্ষেত্রে প্রথম-নীতির কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছিলেন। এর থেকেই পরবর্তী কালে কোয়ান্টাম রসায়নের জন্ম এবং তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন লোউডিন।

ডক্টরেটের কাজ করার পর লোউডিন কোয়ান্টাম মেকানিক্সের তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা উলফগ্যাং পাওলির সাথে তার পোস্টডক্টরাল গবেষণা শুরু করেন। তিনি জন সি. স্লেটারের সলিড-স্টেট এবং মলিকুলার থিওরি গ্রুপের সাথেও এমআইটিতে গঠনমূলক কাজে যুক্ত হন। সেখানে তিনি আমেরিকার বৈজ্ঞানিক প্রক্ষাপটকে আত্মস্থ করেন। বিদেশের লোভনীয় প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও লোউডিন সুইডেনে ফিরে আসেন। সেদেশে তখন কোয়ান্টাম রসায়নের কোনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন ছিল না, তাই দেশে ফিরে তিনি এক অনিশ্চিত শৈক্ষিক ভবিষ্যতের মুখোমুখি হন।

কিন্তু তার প্রত্যাবর্তন একটি অসাধারণ যাত্রার সূচনা করে। মার্কিন প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলির সমালোচনামূলক গবেষণা তহবিলের মাধ্যমে, লোউডিন উপসালা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেন, যার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ছাত্রদের একটি সাধারণ দল এবং হ্যারিসন শুল, জর্জ হল, রুবেন পাউঙ্কজ এবং রয় ম্যাকউইনির মতো পরিদর্শনকারী গবেষকরা ছিলেন। একসাথে, তারা একটি গবেষণা পরিবেশ তৈরি করেছিলেন যা

পের-ওলভ লোউডিন
(28 অক্টোবর 1916–6 অক্টোবর 2000)
(সূত্র: উপসালা কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি গ্রুপ)

তাদের উচ্চমানের বৌদ্ধিক বিনিময়ের জন্য পরিচিত ছিল, যা লোউডিনের কিংবদন্তি সেমিনারের দ্বারা চিহ্নিত ছিল। সেসময় উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ান্টাম রসায়নের অফিসিয়াল অবস্থান ছিল না—ফলে বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করতে অক্ষম ছিল। তাসত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থী লোউডিনের মেধা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে এই বিষয়ে নিজেদের নিযুক্ত করেছিলেন।

লোউডিনের ট্রান্সআটলান্টিক বৈজ্ঞানিক জীবন সত্যিকার অর্থে শুরু হয়েছিল 1959 সালে যখন তিনি ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোয়ান্টাম রসায়নে একটি তাত্ত্বিক গবেষণা গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। এই উদ্যোগটি পরবর্তীকালে বিখ্যাত কোয়ান্টাম থিওরি প্রজেক্ট (QTP) হয়ে ওঠে, যা তাত্ত্বিক রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যার একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে আজও প্রসিদ্ধ। প্রায় একই সময়ে, লোউডিনকে উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোয়ান্টাম রসায়নে ব্যক্তিগত চেয়ার প্রদান করা হয়—অবশেষে সুইডেনে এই বিষয়টিকে একাডেমিক বৈধতা প্রদান করা হয়। এভাবে শুরু হয় লোউডিনের দুই মহাদেশে বিভক্ত কর্মজীবন—চার দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি উপসালায় বছরের অর্ধেক কাটিয়ে, বাকি অর্ধেক কাটিয়েছেন ফ্লোরিডার গেইনসভিলে।

লোউডিনের বৈজ্ঞানিক অবদান ছিল বিশাল, যার মধ্যে রয়েছে মূল তাত্ত্বিক সরঞ্জামগুলির বিকাশ থেকে শুরু করে মৌলিক ধারণা যা আজও গবেষণাকে পরিচালিত করে। “প্রাকৃতিক কক্ষপথ”, “স্পিন প্রক্ষেপণ”, “সম্পর্ক শক্তি”, “লোউডিন অরথোগোনালাইজেশন” এবং “হ্রাসিত ঘনত্ব ম্যাট্রিক্স” এর মতো ধারণাগুলি এখন কোয়ান্টাম রসায়ন এবং ঘনীভূত পদার্থ পদার্থবিদ্যার অপরিহার্য শব্দভাণ্ডারের অংশ। তার কাজ গাণিতিক সৌন্দর্য, ধারণাগত স্পষ্টতা এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সীমাবদ্ধতা এবং সম্ভাবনা উভয়ের গভীর বোধগম্যতার দ্বারা চিহ্নিত ছিল।

লোউডিনের উত্তরাধিকার কেবল সমীকরণ এবং তত্ত্বগুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—এটি প্রতিষ্ঠান, সিম্পোজিয়াম এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বিজ্ঞানীদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। 1958 থেকে 1987 সাল পর্যন্ত তিনি এবং তার সহযোগীরা কোয়ান্টাম রসায়ন এবং সলিড-স্টেট পদার্থবিদ্যা

উলফগ্যাং পাউলি (*সূত্র: উইকিপিডিয়া*)

1975 সালের গ্রীষ্মে নরওয়ের গালধোপিগেন শৃঙ্গে ছাত্রদলের সাথে পের-ওলভ লোউডিন। (*সূত্র: মাইকেল হেহেনবার্গার*)

নরওয়ের গালধোপিগেন শৃঙ্গের সর্বোচ্চ স্থানে পের-ওলভ লাউডিন। (*সূত্র: মাইকেল হেহেনবার্গার*)

চর্চার জন্য কিংবদন্তি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান গ্রীষ্মকালীন স্কুলের আয়োজন করেছিলেন, যা প্রায়শই প্রত্যন্ত পাহাড়ি এলাকায় অনুষ্ঠিত হত। এই স্কুলগুলি তাদের মনোজ্ঞ একাডেমিক সেশন এবং সমানভাবে আকর্ষণীয় পর্বতারোহণের জন্য পরিচিত ছিল—যার অনেকগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লোউডিন নিজেই। অংশগ্রহণকারীরা বৈজ্ঞানিক মননশীলতা এবং আলপাইন অ্যাডভেঞ্চারের অনন্য সমন্বয়কে আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন, যা কেবলমাত্র গবেষণার ধারণাই নয়, বরং আজীবন বন্ধুত্বের সূচনা করেছিল।

এর সমান্তরালে ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিমের সাথে শীতকালীন ইনস্টিটিউটগুলি অনুষ্ঠিত হতো, যা অবশেষে বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত সানিবেল সিম্পোজিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছিল। এটির নামকরণ করা হয়েছিল মেক্সিকো উপসাগরের মনোরম দ্বীপের নামে যেখানে প্রথম ১৭টি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভাগুলি পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের নেতৃস্থানীয় মেধাদের একত্রিত করেছিল। ইন্টারনেট সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার অনেক আগে থেকেই বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করেছিল এই সমাবেশ।

1964 সালে লোউডিন তার প্রভাবশালী বই “সিরিজ অ্যাডভান্সেস ইন কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি” প্রকাশ করা শুরু করেন এবং 1967 সালে তিনি ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ কোয়ান্টাম

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে পের-ওলভ লোউডিন। (*সূত্র: টেলর এন্ড ফ্রান্সিস অনলাইন*)

কেমিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করেন। লোউডিন এর প্রথম সম্পাদক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। এই প্রকাশনা প্ল্যাটফর্মগুলি এই ক্ষেত্রটিকে পরিকাঠামো এবং দৃশ্যমানতা উভয়ই দিয়েছিল, এর অগ্রগতিকে একটি সম্মানিত বৈজ্ঞানিক শাখায় পরিণত করেছিল। তিনি মেন্টনে একাডেমি অফ কোয়ান্টাম মলিকুলার সায়েন্স প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা প্রতিষ্ঠান এবং নেটওয়ার্ক নির্মাতা হিসেবে তার ভূমিকাকে আরো sposto করে তুলে ধরেছিলো।

গেইনসভিল বা উপসালায় লোউডিনের অফিসে প্রবেশ করার অর্থ ছিল বিশ্বব্যাপী তার প্রভাবকে উপলব্ধি করা—রঙিন পিন দিয়ে চিহ্নিত তার ওয়াল ম্যাপে দেখানো হয়েছিল যে তার দলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা এখন কোথায় কোথায় কাজ করছেন—প্রতিটি মহাদেশে এবং প্রায় প্রতিটি দেশে ছড়িয়ে ছিল তার ছাত্রদল। তার ছাত্র এবং সহযোগীরা কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের পরবর্তী প্রজন্মের অগ্রণী হয়ে ওঠেন, তার পদ্ধতি, শৈলী এবং মূল্যবোধকে স্থায়ী করে তোলেন।

লোউডিন তার জীবদ্দশায় অসংখ্য মর্যাদাপূর্ণ সম্মাননা পেয়েছিলেন। তিনি সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড এবং কোরিয়া সহ বেশ কয়েকটি জাতীয় একাডেমির সদস্য ছিলেন। সেইসাথে তিনি আমেরিকান ফিলোসফিক্যাল সোসাইটি, আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটি এবং আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির সদস্যপদও লাভ করেন। তিনি ছিলেন লিজিয়ন অফ অনার-এর একজন শেভালিয়ার, ফরাসি একাডেমি অফ সায়েন্সেস থেকে ল্যাভয়েসিয়ার স্বর্ণপদক এবং সুইডিশ কেমিক্যাল সোসাইটি থেকে অস্কার কার্লসন স্বর্ণপদক বিজেতা। তিনি 1987 সালে WATOC থেকে নীলস বোর পদকও পেয়েছিলেন।

যারা পের-ওলভ লোউডিনকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, তারা উচ্চ শিক্ষাগত মর্যাদা, সীমাহীন শক্তি, উৎসাহ এবং কৌতূহলের অধিকারী একজন মানুষ হিসেবে চিরদিন তাকে স্মরণ করবেন। তিনি কেবল বিজ্ঞানের প্রতিই আগ্রহী ছিলেন না, সঙ্গীত তত্ত্বের প্রতিও তার আগ্রহ ছিল সীমাহীন এবং তিনি ছিলেন একজন দক্ষ পিয়ানোবাদক। বিজ্ঞান, প্রতিসাম্য এবং

অন্তরঙ্গ মুহূর্তে পের-ওলভ লোউডিন। (*সূত্র: টেলর এন্ড ফ্রান্সিস অনলাইন*)

জ্ঞানের অর্থ সম্পর্কে তাঁর দার্শনিক চিন্তাভাবনা প্রায়শই বক্তৃতা এবং কথোপকথনে প্রকাশিত হত, যা তার বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিত্বে একটি অন্তর্মুখী মাত্রা যোগ করে।

2000 সালের 6 অক্টোবর তাঁর নিজ শহর উপসালায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যু সময় তিনি নিকটতম পরিবার পরিজনদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন। তার মৃত্যু একটি যুগের সমাপ্তি চিহ্নিত করে—কিন্তু তাঁর নির্মিত প্রতিষ্ঠান, তাঁর ধারণা এবং তিনি যে সকল মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, তাদের মধ্যে তার চেতনা জীবিত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

পের-ওলভ লোউডিন তার ছাত্র, সহকর্মী এবং সহ-অভিযাত্রীদের কাছে কেবলমাত্র একজন বিজ্ঞানী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন পরামর্শদাতা, একজন দূরদর্শী, সম্পর্কের সেতু-নির্মাতা এবং সর্বোপরি একজন বন্ধু। তাঁর জীবনের কাজ কঠোর বিজ্ঞানের সাথে মানবতাবাদী মূল্যবোধের মিশ্রণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি কেবল কোয়ান্টাম রসায়নকেই রূপদান করেননি—তিনি বিশ্বব্যাপী সেই বিজ্ঞানী সম্প্রদায় গঠনে সহায়তা করেছেন যারা আজ বিজ্ঞানের এই শাখাটির অগ্রগতির ধারক এবং বাহক। ◆

লেখক ***অধ্যাপক ডঃ জাহিদ হুসেন খান*** *UNESCO তালিকাভুক্ত আলোকবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ এবং জাহির সায়েন্স ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা।*
ইমেল: zhkhan1948@yahoo.com

কোয়ান্টাম রসায়ন

অণুর অদৃশ্য জগতের খোঁজ

অমিতেশ ব্যানার্জী

পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের যুগ্ম সীমান্তে এমন একটি ক্ষেত্র রয়েছে যা মহাবিশ্বকে তার সবচেয়ে মৌলিক স্তরে অনুসন্ধান করার প্রেরণা যোগায়, বিজ্ঞানের এই শাখাটিই কোয়ান্টাম রসায়ন নামে পরিচিত। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অদ্ভুত এবং শক্তিশালী নীতিগুলি ব্যবহার করে কোয়ান্টাম রসায়ন বিজ্ঞানীদের ইলেকট্রন, কক্ষপথ এবং পারমাণবিক মিথস্ক্রিয়ার অদৃশ্য জগতে উঁকি দিতে সাহায্য করে। এটি অসাধারণ নির্ভুলতার সাথে আণবিক আচরণের ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম এবং ওষুধ আবিষ্কার থেকে শুরু করে পদার্থ বিজ্ঞান পর্যন্ত সবকিছুতে বিপ্লব ঘটিয়ে চলেছে।

এটি কেবল সংখ্যা এবং সমীকরণের গল্প নয়। এটি মানুষের প্রতিভা, সাহসী অনুমান এবং সেই সকল গবেষক সম্প্রদায়ের একটি আখ্যান যারা আণবিক জগৎ দেখার আগেই মডেলের মাধ্যমে অণুর গঠন ও ব্যবহার অনুমান করার সাহস করেছিলেন।

কোয়ান্টাম রসায়ন হল রাসায়নিক ব্যবস্থায় কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োগ। ম্যাক্রোস্কোপিক বৈশিষ্ট্য এবং আনুমানিক মডেলের উপর নির্ভরশীল ধ্রুপদী রসায়নের বিপরীতে কোয়ান্টাম রসায়ন সঠিক বা আধা-সঠিক গাণিতিক সূত্র ব্যবহার করে পারমাণবিক এবং উপ-পরমাণু স্কেলে ইলেকট্রন এবং নিউক্লিয়াসের আচরণ নিয়ে কাজ করে।

এর মূলে রয়েছে শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ, একটি জটিল ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ যা বর্ণনা করে যে সময়ের সাথে সাথে একটি সিস্টেমের কোয়ান্টাম অবস্থা কীভাবে পরিবর্তিত হয়। এই সমীকরণের সমাধান—তরঙ্গক্রিয়া (wavefunction, Ψ)—আমাদের একটি অণুর শক্তি, গঠন এবং ইলেকট্রন বিতরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য দেয়।

কোয়ান্টাম রসায়ন ইলেকট্রনকে পরিষ্কার কক্ষপথে কণা হিসেবে নয়, বরং সম্ভাব্য মেঘ দ্বারা বর্ণিত তরঙ্গ-সদৃশ সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে। এই বর্ণনাগুলি রাসায়নিক বন্ধন, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং আণবিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

কোয়ান্টাম রসায়নের উৎপত্তি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, নীলস বোর এবং এরউইন শ্রোডিঙ্গারের মতো অগ্রণীদের দ্বারা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের জন্মের পর। পারমাণবিক কাঠামো সম্পর্কে তাদের অন্তর্দৃষ্টি বিজ্ঞানের এই শাখার ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

কোয়ান্টাম রসায়নের বিগত এক শতকের অগ্রগতির পথের মূল মাইলফলকগুলির মধ্যে রয়েছে:

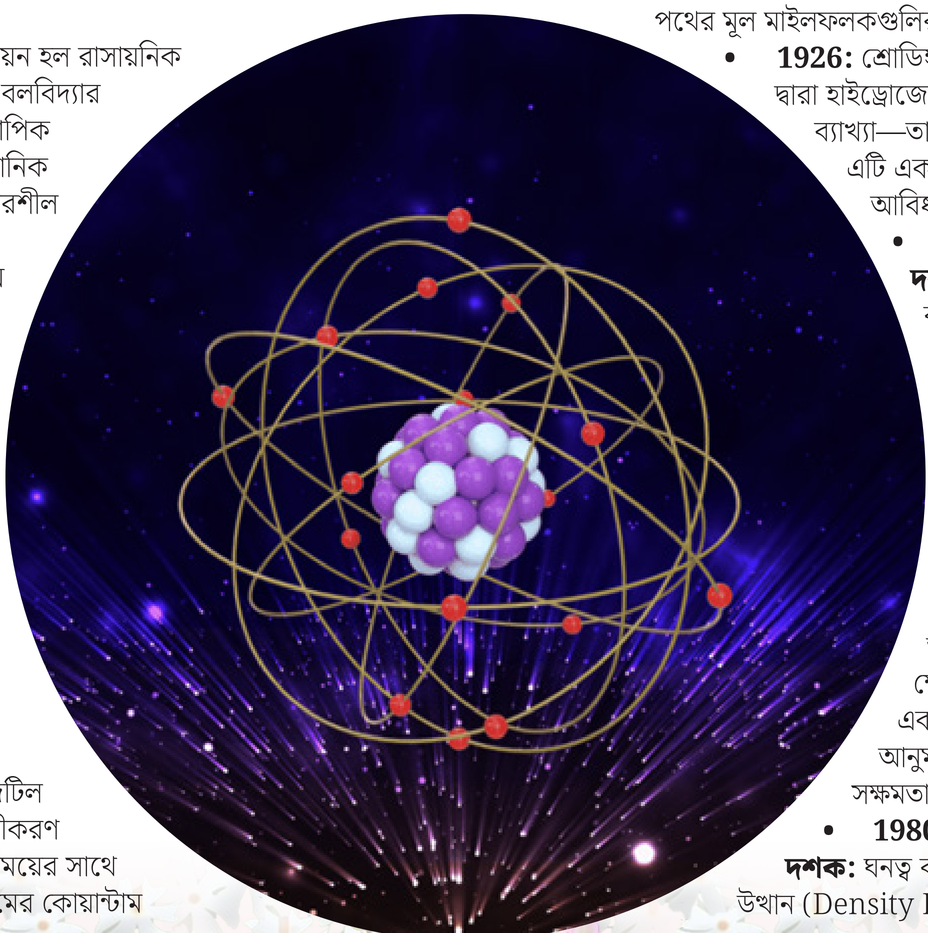

- **1926:** শ্রোডিঙ্গারের সমীকরণ দ্বারা হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাখ্যা—তাত্ত্বিক রসায়নে এটি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।
- **1930-50-এর দশক:** আণবিক কক্ষপথ তত্ত্ব এবং যোজ্যতা বন্ধন (valency bond) তত্ত্বের উত্থান।
- **1950-70-এর দশক:** ডিজিটাল কম্পিউটারের আবির্ভাবের ফলে আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে বিপ্লব এবং জটিল অণুর আনুমানিক সমাধানে সক্ষমতা প্রাপ্তি।
- **1980-2000-এর দশক:** ঘনত্ব কার্যকরী তত্ত্বের উত্থান (Density Functional

Theory, DFT) এবং GAUSSIAN এবং MO-PAC-এর মতো সফ্টওয়্যারের উদ্ভব।

- **বর্তমান:** কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, মেশিন লার্নিং এবং বৃহৎ-স্কেল সিমুলেশনের সাথে একীকরণ।

কোয়ান্টাম রসায়নের মূল ধারণা

কোয়ান্টাম রসায়নের মূল ধারণাগুলোকে যদি সংক্ষেপে তুলে ধরা যায়, সেগুলি হবে অনেকটা এইরকম:

ধারণা	বর্ণনা
তরঙ্গক্রিয়া (Ψ)	অণুতে ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম অবস্থা বর্ণনা করে
পারমাণবিক ও আণবিক কক্ষপথ	পরমাণুর যেসব অঞ্চলে ইলেকট্রন উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা থাকে
ইলেকট্রন স্পিন ও পাউলি নীতি	ইলেকট্রন কীভাবে কক্ষপথ পূরণ করে এবং চৌম্বকত্বকে প্রভাবিত করে তা নির্দেশ করে
শ্রোডিঙ্গার সমীকরণ	পরমাণু এবং অণুতে প্রয়োগ করা কোয়ান্টাম বলবিদ্যার কেন্দ্রীয় সমীকরণ
অ্যাব ইনিশিও পদ্ধতি	শুধুমাত্র ভৌত নিয়মের উপর ভিত্তি করে গণনা (যেমন, হার্ট্রি-ফক, MP2)
ঘনত্ব কার্যকরী তত্ত্ব (DFT)	ইলেকট্রন ঘনত্বের উপর ফোকাস; বৃহৎ আকারের সিস্টেমের জন্য কার্যকর
কোয়ান্টাম টানেলিং	কণাদের বাধা অতিক্রম করে প্রবাহিত হওয়া—বিক্রিয়া এবং উৎসেচকের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

কোয়ান্টাম রসায়নের বাস্তব প্রয়োগ

যদিও কোয়ান্টাম রসায়নকে প্রায়শই বিজ্ঞানের একটি তাত্ত্বিক শাখা হিসেবে দেখা হয়, বাস্তবে কেবল ব্ল্যাকবোর্ড এবং সমীকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি বেশ কয়েকটি আধুনিক প্রযুক্তি এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোয়ান্টাম স্কেলে ইলেকট্রন এবং পরমাণুর আচরণ প্রকাশ করে, কোয়ান্টাম রসায়ন আমাদের আরও ভাল ওষুধ ডিজাইন করতে, আরও দক্ষ অনুঘটক তৈরি করতে, উন্নত উপকরণ বিকাশ করতে এবং এমনকি জীবনের মৌলিক প্রক্রিয়াগুলি অন্বেষণ করতে সাহায্য করে।

আসুন, আমরা এমন কিছু সবচেয়ে প্রভাবশালী ক্ষেত্র সম্বন্ধে আলোচনা করি যেখানে কোয়ান্টাম রসায়ন বাস্তবিক ভাবেই নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

ড্রাগ ডিজাইন এবং ফার্মাসিউটিক্যালস

কোয়ান্টাম রসায়নের সবচেয়ে রূপান্তরকারী প্রয়োগগুলির মধ্যে অন্যতম ফার্মাসিউটিক্যাল গবেষণা। কম্পিউটেশনাল কোয়ান্টাম মডেল ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন যে

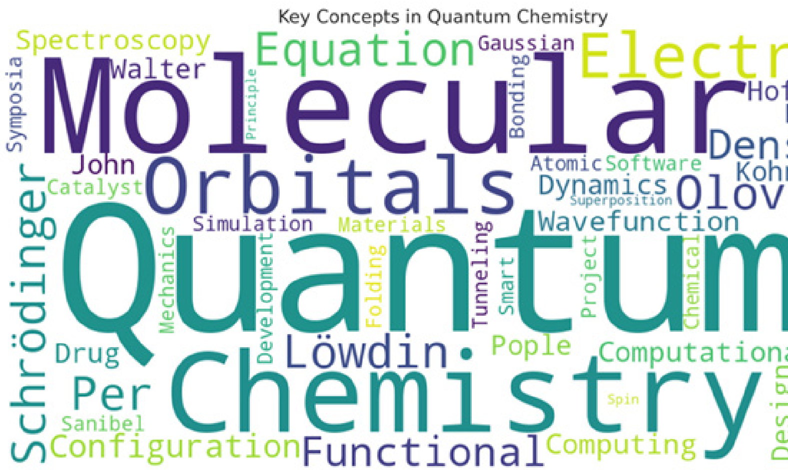

কীভাবে একটি সম্ভাব্য ওষুধের অণু তার জৈবিক লক্ষ্যের সাথে মিথস্ক্রিয়া করবে—যা সাধারণ ভাবে একটি প্রোটিন বা একটি এনজাইম। এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শক্তি ওষুধ আবিষ্কারের ট্রায়াল-এন্ড-এরর পর্যায়কে উল্লেখযোগ্যভাবে সংক্ষিপ্ত করে, খরচ হ্রাস করে এবং উন্নয়নের সময়সীমা ত্বরান্বিত করে।

সংশ্লেষণের আগে আণবিক মিথস্ক্রিয়া অনুকরণ করে কোয়ান্টাম রসায়ন গবেষকদের সম্ভাব্য ওষুধের গঠন এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা সূক্ষ্মতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে, যার ফলে নিরাপদ এবং আরও কার্যকর ওষুধ তৈরি হয়।

অনুঘটক এবং সবুজ রসায়ন

অনুঘটক হল এমন পদার্থ যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ না করেই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। জ্বালানি উৎপাদন থেকে শুরু করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত শিল্পের জন্য দক্ষ, নির্বাচনী এবং টেকসই অনুঘটক নির্বাচন বা তৈরী করা অপরিহার্য।

কোয়ান্টাম রসায়ন পারমাণবিক স্তরে প্রতিক্রিয়া পথের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যা রসায়নবিদদের শক্তির বাধাগুলি কোথায় এবং কীভাবে সেগুলি হ্রাস করা যায় তা সনাক্ত করতে সাহায্যও করে। এটি সবুজ রসায়নের উপর গভীর প্রভাব ফেলে, যেখানে লক্ষ্য হল এমন শিল্প প্রক্রিয়া বিকাশ করা যা কেবল দক্ষই নয় বরং পরিবেশবান্ধবও। এই সিমুলেশনগুলির মাধ্যমে কোয়ান্টাম রসায়ন পরিষ্কার, নিরাপদ এবং আরও টেকসই অনুঘটক ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পদার্থ বিজ্ঞান ও ন্যানোপ্রযুক্তি

অতি-পাতলা গ্রাফিন শিট থেকে শুরু করে উন্নত ব্যাটারি উপকরণ এবং কোয়ান্টাম ডট পর্যন্ত, কোয়ান্টাম রসায়ন পদার্থ উদ্ভাবনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। এটি বিজ্ঞানীদের পারমাণবিক এবং আণবিক কাঠামো কীভাবে বৈদ্যুতিক, তাপীয় এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করে তা মডেল করতে সহায়তা করে।

কোয়ান্টাম সিমুলেশনগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে যে, চাপের মধ্যে পদার্থগুলি কীভাবে আচরণ করবে,

সেমিকন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন কীভাবে চলাচল করবে, অথবা সৌর প্যানেল দ্বারা আলো কীভাবে শোষিত হবে। পরবর্তী প্রজন্মের সেমিকন্ডাক্টর, সৌর কোষ, স্মার্ট টেক্সটাইল এবং শক্তি সঞ্চয় ডিভাইস ডিজাইন করার ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ক্ষমতা অমূল্য।

বর্ণালী এবং আলোর মিথস্ক্রিয়া

বিশ্লেষণাত্মক রসায়নে আলোর সাথে অণু কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করে তা বোঝা অপরিহার্য। কোয়ান্টাম রসায়ন শক্তি স্তরের মধ্যে ইলেকট্রন কীভাবে স্থানান্তরিত হয় তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে, শোষণ এবং নির্গমন বর্ণালী ব্যাখ্যা করার ভিত্তি প্রদান করে।

এই জ্ঞান NMR (নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স), IR (ইনফ্রারেড), UV-Vis এবং এক্স-রে বর্ণালীকে সমর্থন করে, যা রসায়নবিদদের অজানা পদার্থের গঠন এবং আকৃতি নির্ভুলতার সাথে নির্ধারণ করতে সক্ষম করে।

কোয়ান্টাম জীববিজ্ঞান

কোয়ান্টাম রসায়ন জীববিজ্ঞানেও আকর্ষণীয় প্রয়োগ খুঁজে পেয়েছে। সালোকসংশ্লেষণ, এনজাইম প্রক্রিয়া এবং প্রোটিন ফোল্ডিং মডেলিং করে গবেষকরা জীবন্ত প্রাণীর কোয়ান্টাম ঘটনা উন্মোচন করছেন। উদাহরণস্বরূপ, কোয়ান্টাম টানেলিং এনজাইমেটিক বিক্রিয়ায় ভূমিকা পালন করতে পারে এবং কোয়ান্টাম সমন্বয় সালোকসংশ্লেষণ ব্যবস্থায় শক্তি স্থানান্তরকে উন্নত করতে পারে।

কোয়ান্টাম জীববিজ্ঞানের এই ক্রমবর্ধমান ক্ষেত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং জীবন বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান দূর করে, আন্তঃবিষয়ক গবেষণার জন্য নতুন পথ খুলে দেয়। সংক্ষেপে, কোয়ান্টাম রসায়ন কেবল একটি তত্ত্ব নয়—এটি বাস্তবের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি অপরিহার্য হাতিয়ার, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভবিষ্যতকে এক নতুন রূপদান করে। বাস্তব অণুর জন্য কোয়ান্টাম সমীকরণ সমাধানের জন্য প্রচুর গণনামূলক শক্তির প্রয়োজন। রসায়নবিদরা এখন নিয়মিতভাবে শত শত পরমাণুর অণু মডেল করার জন্য সিমুলেশন সরঞ্জাম ব্যবহার পারেন, যার সম্পূর্ণ কৃতিত্বের দাবিদার কম্পিউটার বিজ্ঞানের অগ্রগতি।

জনপ্রিয় সফ্টওয়্যার:

•**গাউসিয়ান**—সাধারণ-উদ্দেশ্য ইলেকট্রনিক কাঠামো মডেলিং

• **ORCA, VASP, NWChem, TURBOMOLE**—বিভিন্ন গণনার জন্য বিশেষায়িত

উদীয়মান সীমানাগুলির মধ্যে রয়েছে:

• মেশিন লার্নিং-অ্যাক্সিলারেটেড কোয়ান্টাম রসায়ন
• কোয়ান্টাম কম্পিউটারে কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম (যেমন, ভেরিয়েশনাল কোয়ান্টাম আইজেনসলভার)
• রিয়েল-টাইম অণু বিশ্লেষণের জন্য ক্লাউড-ভিত্তিক সিমুলেশন

এই সমস্ত কোড এবং গণনার পিছনে লুকিয়ে আছে একটি মানবিক কাহিনী—দূরদৃষ্টি, সাহস এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কোয়ান্টাম রসায়নের ভিত্তি স্থাপনকারী একজন উজ্জ্বল মনের মানুষ।

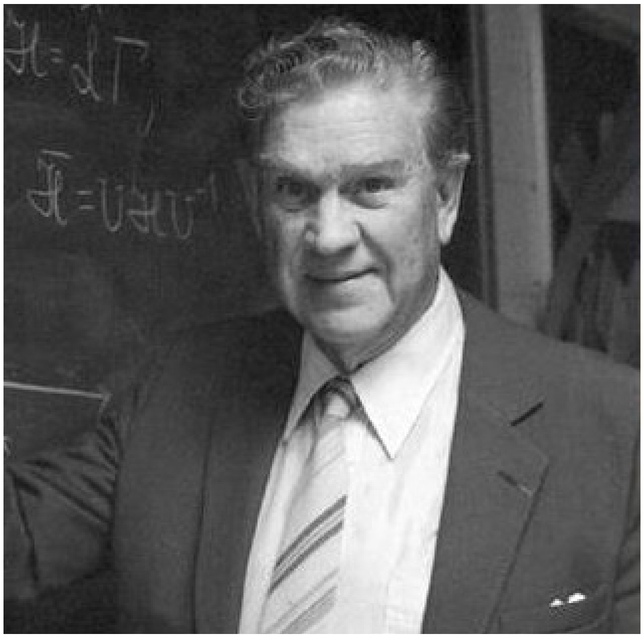

পের-ওলভ লোউডিন

পের-ওলভ লোউডিন: বিজ্ঞানের একটি শাখার স্থপতি

কোয়ান্টাম রসায়নের জনক হিসেবে খ্যাত, লোউডিন ফ্লোরিডায় কোয়ান্টাম থিওরি প্রজেক্ট এবং ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞানের এই শাখাটিকে উপযুক্ত পরিকাঠামো প্রদান করেন। স্ক্যান্ডিনেভিয়া এবং সানিবেল সিম্পোজিয়ায় তাঁর গ্রীষ্মকালীন স্কুলগুলি বিশ্বব্যাপী বৈজ্ঞানিক বিনিময়কে উৎসাহিত করেছিল।

জন পপল এবং ওয়াল্টার কোহন: গণনার পথিকৃৎ

কম্পিউটেশনাল মডেলের উপর পপলের কাজ বিশ্বব্যাপী রসায়নবিদদের কাছে প্রাথমিক পদ্ধতিগুলিকে সহজলভ্য করে তুলেছিল। কোহনের ঘনত্ব কার্যকরী তত্ত্ব আধুনিক আণবিক সিমুলেশনের ভিত্তি হয়ে ওঠে।

জন পপল

ওয়াল্টার কোহন

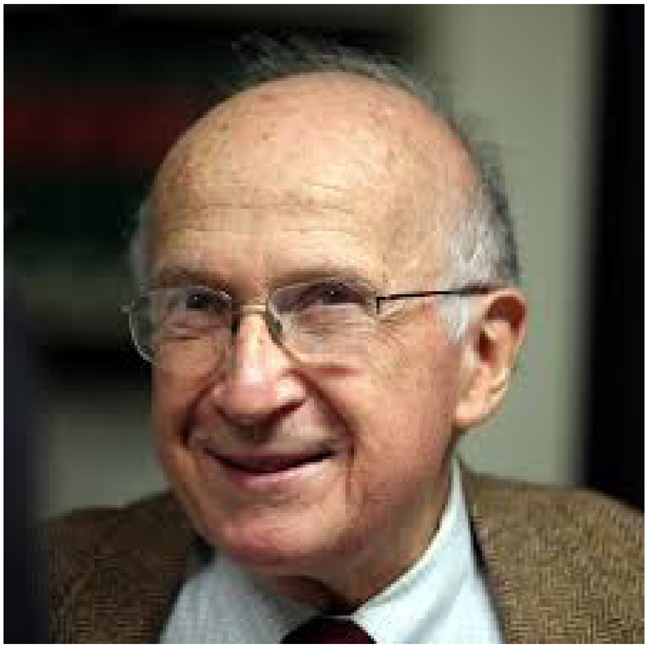

রোয়াল্ড হফম্যান

রোয়াল্ড হফম্যান: তাত্ত্বিক রসায়নবিদ

সীমান্ত আণবিক কক্ষপথ তত্ত্বে তাঁর অবদান তাত্ত্বিক রসায়নকে ব্যবহারিক অন্তর্দৃষ্টির সাথে সংযুক্ত করেছিল, ব্যাখ্যা করেছিল যে কীভাবে এবং কেন প্রতিক্রিয়া ঘটে।

এই চিন্তাবিদরা কেবল জ্ঞানকে এগিয়ে নেননি—তারা তাদের কাজকে ভবিষ্যতে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সম্প্রদায় তৈরি করেছিলেন। স্কুল, সিম্পোজিয়া এবং জার্নালের মাধ্যমে, তারা উন্মুক্ত অনুসন্ধান, পরামর্শদান এবং বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার একটি সংস্কৃতি তৈরী করেছিলেন যা আজও বেঁচে আছে।

কোয়ান্টাম রসায়ন আরেকটি বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে, সেটি হলো কোয়ান্টাম কম্পিউটিং। এই পরবর্তী প্রজন্মের মেশিনগুলি কিউবিটে কাজ করে, যা ক্লাসিক্যাল কম্পিউটিংয়ের বাইরেও সমান্তরালতা সক্ষম করে।

বিজ্ঞানের এই গুরুত্বপূর্ণ শাখার সম্ভাব্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে:

• অভূতপূর্ব নির্ভুলতার সাথে বৃহৎ জৈব অণু মডেলিং
• জটিল ইলেকট্রনিক কাঠামোর সমস্যা সমাধান
• শক্তি, স্থায়িত্ব এবং স্থানের জন্য নতুন উপকরণ আবিষ্কার

রসায়নবিদ, পদার্থবিদ, কম্পিউটার বিজ্ঞানী এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সহযোগিতার মাধ্যমে, কোয়ান্টাম রসায়নের ভবিষ্যৎ কেবল উজ্জ্বলই নয় - এটি অভাবনীয় শক্তিশালী। আমাদের কাছে বর্তমানে যা অবর্ণনীয় - আমরা যে বন্ধনগুলি দেখতে পাই না, যে প্রতিক্রিয়াগুলি আমরা স্পর্শ করতে পারি না এবং যে শক্তিগুলি পদার্থকে একসাথে ধরে রাখে - কোয়ান্টাম রসায়ন সেগুলি বর্ণনা করার জন্য একটি ভাষা দেয়। এটি রসায়নকে একটি পরীক্ষামূলক শিল্প থেকে একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিজ্ঞানে রূপান্তরিত করে, যেখানে তত্ত্ব সংশ্লেষণকে নির্দেশ করে এবং যেখানে সিমুলেশন বাস্তবতাকে রূপ দেয়।

জলবায়ু পরিবর্তন থেকে ঔষধ, শক্তি পর্যন্ত আণবিক চ্যালেঞ্জ দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি যুগে, কোয়ান্টাম রসায়ন আমাদের ক্ষুদ্রতম স্কেলে চিন্তা করার এবং বৃহত্তর পর্যায়ে কাজ করার সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত করে। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ইলেকট্রনের রহস্যময় নৃত্য এবং তরঙ্গক্রিয়ার সৌন্দর্যের মধ্যে মানবজাতির কিছু বৃহৎ সমস্যা সমাধানের মূল চাবিকাঠি লুকিয়ে রয়েছে। ◆

*লেখক **শ্রী অমিতেশ ব্যানার্জী** বিজ্ঞানকর্মী ও এই পত্রিকার সাথে যুক্ত। ইমেল: amiteshbanerjee1@gmail.com*

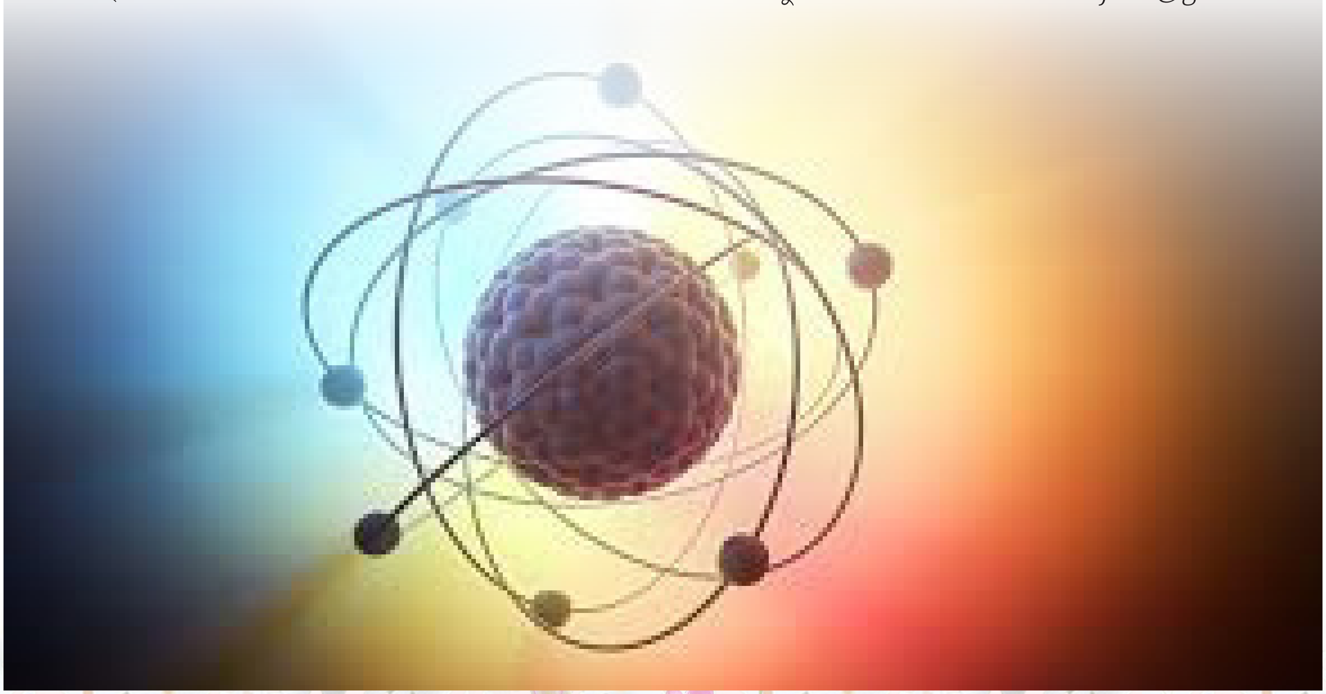

রামানুজন সংখ্যা 1729
জানা সংখ্যার কিছু অজানা কথা

ভূপতি চক্রবর্তী

গোড়ার কথা

শুরু করা যাক, একটা ভীষণ চেনা আর বহুবার শোনা একটা কাহিনী দিয়ে। কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি বিশেষ সংখ্যা এবং আমাদের দেশের এক অসাধারণ প্রতিভাবান গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজনের নাম। মাত্র বত্রিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে যে রামানুজনের গাণিতিক অবদান একশ বছরেরও বেশি সময় ধরে গণিতের জগতকে ঋদ্ধ করে চলেছে এই কাহিনী সেই রামানুজনকে ঘিরে। সংক্ষেপে আরও একবার বলে নেওয়া যাক, সেই জানা কাহিনী।

অসুস্থ রামানুজন ইংল্যান্ডে লন্ডন শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পাটনিতে হাসপাতালে শয্যাশায়ী, তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ইংরেজ গণিতজ্ঞ জিএইচ হার্ডি, যিনি কেমব্রিজের এক নামকরা গণিতের অধ্যাপক এবং রামানুজনের ছাই-চাপা প্রতিভা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার ব্যাপারে যার ছিল এক অনন্য ভূমিকা। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সালটা 1918; ভারত তখন ব্রিটিশ শাসনের অধীন। অসুস্থ রামানুজন দু'চার কথার পরে জানতে পারলেন যে অধ্যাপক হার্ডি হাসপাতালে এসেছেন এক ট্যাক্সি চড়ে। মোটরগাড়ি ট্যক্সি বা আজকের ভাষায় ক্যাব হিসেবে তখন একটু একটু করে ব্যবহৃত হচ্ছে, তখনও তা যথেষ্ট সম্ভ্রমের বিষয়। সম্ভবত তাই রামানুজন জানতে চাইলেন কী ছিল সেই ট্যাক্সির নম্বর। হার্ডিও সম্ভবত তার ক্যাব-যাত্রা উপভোগ করেছিলেন আর তাই তিনি সেই গাড়িটির নম্বর মনে রেখেছিলেন।

খুব সহজেই তিনি জানালেন যে সেই নম্বর হচ্ছে 1729 এবং সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিলেন যে এই নম্বরটা তো মনে হয় না, তেমন ইন্টারেস্টিং, তাই না? কারণ, হার্ডি জানতেন; যে কোন সংখ্যা রামানুজনের ভেতরে যেন এক বিশেষ তরঙ্গের সৃষ্টি করে, আর রামানুজন যেন তার গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করে দেখতে পান, চারদিকের আপাত বৈশিষ্ট্যহীন অজস্র সংখ্যার গভীরে আদতে কত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। হার্ডিরই আর এক সহকর্মী যিনি রামানুজনকে খুব কাছ থেকে দেখাছিলেন সেই গণিতজ্ঞ লিটলউড মনে করতেন প্রতিটি পূর্ণ সংখ্যাই রামানুজনের বিশেষ বন্ধু, যাদের সম্পর্কে রামানুজন গভীরভাবে জানেন, চিন্তা করেন, ধরে ফেলেন তাদের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা অনেকেরই নজর এড়িয়ে গেছে। তাই হার্ডি 1729 নিয়ে সেদিন যাই ভেবে থাকুন না কেন, হাসপাতালে শয্যাশায়ী রামানুজন কিন্তু তৎক্ষণাৎ জানিয়েছিলেন যে, 1729 একটি খুবই চিত্তাকর্ষক সংখ্যা, কারণ এটিই হচ্ছে সেই ক্ষুদ্রতম সংখ্যা যাকে দুটি অখন্ড রাশির ঘনকের সমষ্ঠি হিসেবে দুটি ভিন্নভাবে প্রকাশ করা যায়। তিনি দেখিয়েছিলেন,

$$1729 = 9^3 + 10^3$$
$$1729 = 1^3 + 12^3$$

স্বাভাবিকভাবেই হার্ডি কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তার মাধ্যমেই এই 1729 এবং তার বৈশিষ্ট্য ও তার সঙ্গে হাসপাতালের এই ঘটনাটি সর্বসাধারণের, বিশেষ করে গণিতে আগ্রহীদের সামনে এলো। ব্রিটিশদের কাছে খুব সহজেই এই সংখ্যাটির নাম হয়ে গেল, ট্যাক্সিক্যাব নাম্বার। অর্থাৎ ঐ সংখ্যার যে বৈশিষ্ট্য জানা গেল, তা যেন নিছক একটি ট্যাক্সির নম্বর

শ্রীনিবাস রামানুজন

জি এইচ হার্ডি

হওয়ার সুবাদে! অনেকে তাকে বলতে চাইলেন, হার্ডি-রামানুজন নাম্বার বা সংখ্যা, কেউবা তাকে একেবারে হার্ডি-রামানুজন-ট্যাক্সিক্যাব নাম্বার হিসেবে চিহ্নিত করে যেন সবদিক রক্ষা করতে চাইলেন। অর্থাৎ এই সংখ্যাটির জন্য রামানুজনকে একক কৃতিত্ব দিতে যেন ব্রিটিশদের অনেকেরই ছিল কিছুটা আপত্তি। কিন্তু ওই আপাতনিরীহ 1729 কে কিন্তু বিশেষ মর্যাদার আসনে তুলে আনলেন শ্রীনিবাস রামানুজন। তাই 1729 হচ্ছে রামানুজন

দুজোড়া ভিন্ন সংখ্যার ঘন হিসেবে 1729 যে প্রকাশ করা যায়, তার একটি জ্যামিতিক রূপ (*ঋণ স্বীকার Wikipedia*)

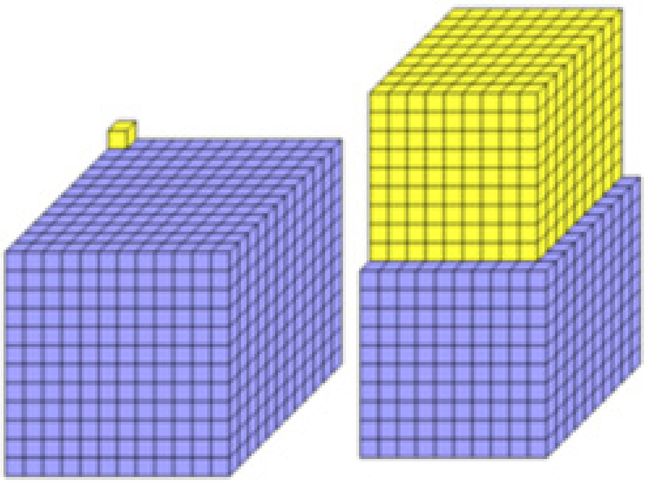

সংখ্যা যদিও তার ভিন্ন নামগুলিও চালু রয়েছে। আমরা বরং একটু দেখার চেষ্টা করব 1729 এর শুরুর ব্যাপারটা আমরা জানি সেটাই কি তার প্রকৃত শুরু? নাকি আরও কিছু ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, ঐ 1729 এর মধ্যে।

পিয়ের দ্য ফার্মা এবং ফিরে দেখা ইতিহাস

ইতিহাস কিন্তু বলছে যে 1729 সংখ্যার বিষয়ে আলোচনা আদতে শুরু হয়েছিল আজ থেকে সাড়ে তিনশ বছরেরও আগে 1657 সালে, যখন ইংল্যান্ডে আইজাক নিউটন নিতান্তই এক কিশোর। ফরাসি আইনজ্ঞ, গণিত-বিশারদ এবং বিপুল প্রতিভার অধিকারী পিয়ের দ্য ফার্মা (1601–1665) ঐ বছর 15ই আগস্ট দক্ষিণ ফ্রান্সের কাসত্রেস (Castres) থেকে একটা চিঠি পাঠালেন তার পরিচিত ইংরেজ কূটনীতিবিদ কেনলেম ডিগবিকে।

ডিগবি একাধারে ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজপ্রতিনিধি অন্যদিকে এক প্রাকৃতিক দার্শনিক যা আজকের পরিভাষায় বিজ্ঞানে আগ্রহী একজন মানুষ। কর্মসূত্রে তিনি তখন প্যারিসে। ফার্মা তার চিঠিতে দুটি গাণিতিক সমস্যার কথা তুলে ধরেছিলেন। ডিগবিকে তিনি অনুরোধ করেছিলেন সেগুলির সমাধানের জন্য তিনি যেন কয়েকজন বিশিষ্ট ইংরেজ গণিতবিদদের কাছে তার প্রশ্নগুলো পৌঁছে দেন। সেই সময়কার প্রথম সারির ইওরোপীয় গণিতবিদদের মধ্যে ছিলেন, উইলিয়াম ব্রোউঙ্কার, জন ওয়ালিস, বার্নার্ড ফ্রেনিকল দ্য বেসি প্রমুখেরা। ফার্মার দুটি প্রশ্ন ছিল এইরকম,

১। দুটি এমন সংখ্যা বার করুন যাদের ঘনকের সমষ্টি হবে অন্য দুটি সংখ্যার ঘনকের যোগফলের সমান।
২। দুটি এমন সংখ্যা চিহ্নিত করুন যাদের ঘনকের সমষ্টি হিসেবে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে সেটিও হবে কোন একটি সংখ্যার ঘনক।

পিয়ের দ্য ফার্মা

গাণিতিক ভাষায় সমস্যা দুটি লিখলে তা হবে প্রথম ক্ষেত্রে

$$a^3 + b^3 = x^3 + y^3$$

যেখানে a, b, x, y প্রতিটিই একটি অখন্ড বা পূর্ণ ধনাত্মক সংখ্যা

এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমস্যাটি হবে, দুটি অখন্ড ধনাত্মক সংখ্যার ঘনকের যোগফল হবে আর একটি সংখ্যার ঘনকের সমান। অর্থাৎ p, q, r তিনটি অখন্ড ধনাত্মক সংখ্যা হলে তাদের মধ্যে

$$p^3 + q^3 = r^3$$

এই সম্পর্কটি রয়েছে এমন p, q, r খুঁজে বার করতে হবে। এ যেন কতকটা পিথাগোরাসের উপপাদ্যের মত কেবল তিনটি অখন্ড সংখ্যার ঘাত হবে 2 এর জায়গায় 3। আপাতদৃষ্টিতে বেশ নিরীহ দেখালেও এটি ছিল একটি যুগান্তকারী সমস্যা। সেই আলোচনায় আসছি।

বস্তুত মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যে প্রথম কাজটিতে সফল হলেন বার্নার্ড ফ্রেনিকল দ্য বেসি। এবং ব্রোঙ্কার সেই খবর ওয়ালিসকে জানালেন ওই বছরের অক্টোবর মাসে লেখা একটি চিঠিতে। ফ্রেনিকল তার চিঠিতে প্রথম যে দুটি সমাধান দিলেন তা হচ্ছে;

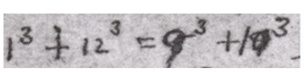

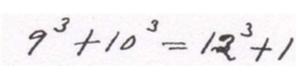

$$1729 = 9^3 + 10^3 = 1^3 + 12^3$$

এবং $$4104 = 9^3 + 15^3 = 2^3 + 16^3$$

কাজগুলি কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না। পরবর্তীকালে একই ধরণের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আরও কয়েকটি সংখ্যা পাওয়া গেছে, কিন্তু খুব সহজে নয়। বস্তুত এক লক্ষের থেকে ছোট রামানুজন সংখ্যার ধর্মসম্পন্ন নাম্বার রয়েছে মোট দশটি। এগুলি হল;

- $1729: 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$
- $4104: 2^3 + 16^3 = 9^3 + 15^3$
- $13832: 2^3 + 24^3 = 18^3 + 20^3$
- $20683: 10^3 + 27^3 = 19^3 + 24^3$
- $32832: 4^3 + 32^3 = 18^3 + 30^3$
- $39312: 2^3 + 34^3 = 15^3 + 33^3$
- $40033: 9^3 + 34^3 = 16^3 + 33^3$
- $46683: 3^3 + 36^3 = 27^3 + 30^3$
- $64232: 17^3 + 39^3 = 26^3 + 36^3$
- $65728: 12^3 + 40^3 = 31^3 + 33^3$

মনে রাখতে হবে এর মধ্যে অপেক্ষা বড় সংখ্যাগুলি পেতে সাহায্য লেগেছে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমপিউটারের। আর রামানুজন সংখ্যা 1729 হচ্ছে এইরকম ধরণের সংখ্যার (অর্থাৎ দুটি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সংখ্যার ঘনকের যোগফলের সমান) মধ্যে সর্বনিম্ন।

তবে একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে যে এই এই দলে এমন চারটি সংখ্যা রয়েছে যাদের মধ্যে রামানুজন সংখ্যার বৈশিষ্ট্য থাকলেও সেখানে রয়েছে বৈচিত্র্যের অভাব। যেমন, আমরা যদি রামানুজন সংখ্যার শ্রেণীভুক্ত সবক'টি সংখ্যাকে আর একটি ঘন সংখ্যা দিয়ে গুণ করি তাহলে যে আপাতদৃষ্টিতে নতুন সংখ্যা পাওয়া যাবে, সেখানেও থাকবে রামানুজন সংখ্যার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তার ফলে সেখানে যে সংখ্যাগুলির ঘন নিয়ে আমরা কাজ করবো প্রকৃত অর্থে তারা কি নতুন সংখ্যা? একটা উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক।

1729 কে 8 বা 2^3 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে

$$8 \times 1729 = 13832 = 2^3 \times 1729 = 13832$$
$$= 2^3 \times 9^3 + 2^3 \times 10^3$$
$$= 18^3 + 20^3$$
$$2^3 \times 1729 = 13832 = 2^3 \times 1^3 + 2^3 \times 12^3$$
$$= 2^3 + 24^3$$

অর্থাৎ 13832 কে রামানুজন সংখ্যা বলা যায়, কিন্তু সেই অর্থে এটি আর একটি রামানুজন সংখ্যাকে উপযুক্ত নাম্বার দিয়ে গুণ করে পাওয়া গেছে। একই ভাবে 1729 কে 3^3 বা 27 দিয়ে গুণ করে যে 46683 পাওয়া যাচ্ছে সেটিও প্রকৃত অর্থে মৌলিক রামানুজন সংখ্যা নয়।

$$27 \times 1729 = 46683 = 3^3 \times 1729 = 46683$$
$$= 27^3 + 30^3 = 3^3 + 36^3$$

দেখা যাচ্ছে যে 27^3 এবং 30^3 থেকে আমরা উভয়ের সাধারণ উৎপাদক 3^3 বার করে নিয়ে এলে আমরা পুরোনো সংখ্যাগুলিতেই পৌঁছে যাব। কিংবা 3^3 এবং 36^3 থেকে সেই 3^3 কে কমন নিলে সেই একইভাবে 1729 এবং তার গঠনের জন্য ব্যবহৃত সংখ্যাগুলিতেই ফিরে আসবো। একই ভাবে 4104 কে যথাক্রমে 8 বা 2^3 দিয়ে গুণ করে যথাক্রমে পাওয়া যাবে 32832, যেখানে,

$$2^3 \times 4104 = 8 \times 4104 = 32832$$
$$= 4^3 + 32^3 = 18^3 + 30^3$$

এখানে কয়েকটি সংখ্যা নিয়ে আলোচনা হলেও বোঝা যাচ্ছে যে, এই রাস্তায় অজস্র সংখ্যা পাওয়া সম্ভব। যাই হোক আমাদের ফিরে আসতে হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে । রামানুজন কি এই 1729 সংখ্যাটি সম্পর্কে আগেই জানতেন? মানে সংখ্যাটি তার স্মৃতিতে ধরা ছিল? মনে হয়; না। কারণ হঠাৎ করে একটা গাণিতিক কিছু বলে তাক লাগানোর চেষ্টা করার প্রবণতা রামানুজনের ছিল না। নানা সংখ্যা তার কাছে কীভাবে ধরা দিত তা কিন্তু একেবারেই রহস্য থেকে গেছে। বরং বলা যায় যে কিছুটা পুরোনো এক ইন্টারেস্টিং সংখ্যা 1729 কে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্য রামানুজনের এক নিশ্চিত অবদান রয়েছে।

ফার্মার শেষ উপপাদ্য

লক্ষ করলে দেখা যাবে, ইতিহাস বলছে যে ফার্মার অপর প্রশ্নটির উত্তর সেই সময় মেলে নি। অর্থাৎ এমন তিনটি অখন্ড সংখ্যা p, q, r পাওয়া যায় নি, যেখানে ক্ষুদ্রতর দুটি সংখ্যার ঘনকের সমষ্টি হবে বৃহত্তর সংখ্যাটির ঘনকের সমান।

$$p^3 + q^3 = r^3$$

এখানে p, q, r তিনটি অখন্ড ধনাত্মক সংখ্যা, এমন সংখ্যাদের কিন্তু সেই সময়কার গণিতজ্ঞেরা খুঁজে পেলেন না। আপাতদৃষ্টিতে এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা আর দেখা গেল না। একটু লক্ষ করলে দেখ যাবে, এই গাণিতিক সমস্যাটিই চিহ্নিত হয়েছে ফার্মার শেষ উপপাদ্য হিসেবে, এখানে বলা হয়েছে, p, q, r এবং n চারটি অখন্ড ধনাত্মক সংখ্যা হলে, $p^n + q^n = r^n$ সম্পর্কটি 'n' এর মান 3 বা তার এর বেশি বা বলা যায় $n > 2$ হলে কখনই পাওয়া সম্ভব নয়। মজার কথা এই যে $n = 2$ হলে এই সমস্যাটি পিথাগোরাসের উপপাদ্যে পরিণত হয়, যেখানে একটি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহুর বর্গের সমষ্টি সেই ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গের সমান হয়।

Arithmeticorum Liber II. 61

IN QVAESTIONEM VII.

QVAESTIO VIII.

OBSERVATIO DOMINI PETRI DE FERMAT.

QVAESTIO IX.

এইরকম একটি বইয়ের মার্জিনে ফার্মা তার মন্তব্য লিখেছিলেন

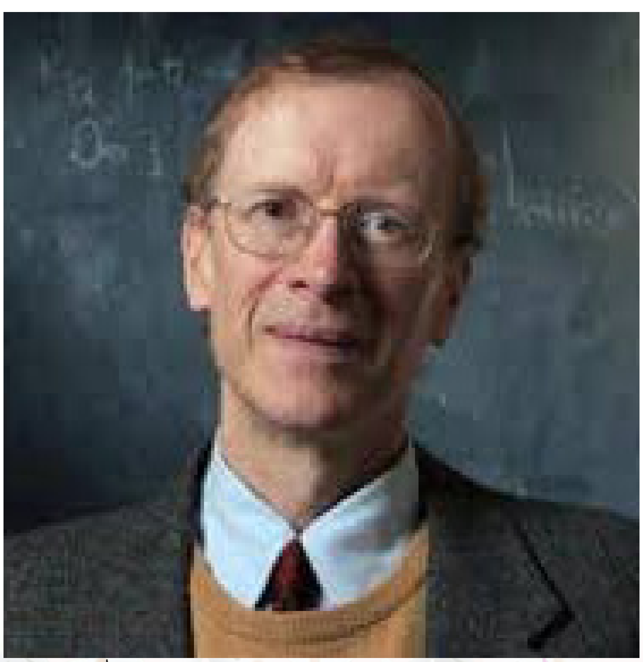
অ্যান্ড্রু ওয়াইলস

সুতরাং ফার্মার দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে নিরীহ দ্বিতীয় প্রবলেমটি মোটেই সহজ কিছু ছিল না। আমরা জানি যে সেই সময় তার সমাধান তো মেলেই নি, বরং পরবর্তীকালে এটি চিহ্নিত হয়েছে ফার্মার শেষ উপপাদ্য (Fermat's Last Theorem) হিসেবে। এই প্রবলেম তাড়া করে বেড়িয়েছে স্বয়ং ফার্মাকে এবং তার পরবর্তী বহু প্রথম সারির গণিতজ্ঞকে।

ফার্মা নিজে কি এই প্রবলেমের সমাধান পেয়েছিলেন? সেখানেও রয়েছে এক রহস্য। তিনি তার হাতে থাকা একটি বইয়ের (পরের ছবি) মার্জিনে লিখেছিলেন যে এই প্রবলেমের একটা চমৎকার সমাধান পাওয়া গেছে কিন্তু এই জায়গাটা সেই সমাধান লেখার জন্য বড়ই ছোট। আর তার সেই লেখা আবিষ্কার হয়েছিল 1665 সালে নাগাদ তার মৃত্যুর পরে। লক্ষণীয় বিষয় যে তিনি এই গাণিতিক সমস্যাটি উত্থাপন করেছিলেন 1657 সালে। তাই ধরা যায় যে, তার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত প্রায় সাত আট বছরে সেই সমাধান মেলে নি। তিনি যে সমাধান পেয়েছেন বলে তার বইয়ের মার্জিনে উল্লেখ করেছিলেন তার কোন কাগজপত্র বা অন্য নথি সামনে আসে নি। এবং ফার্মার পরবর্তী অনেক প্রথম সারির গণিতজ্ঞদের

মঞ্জুল ভার্গব

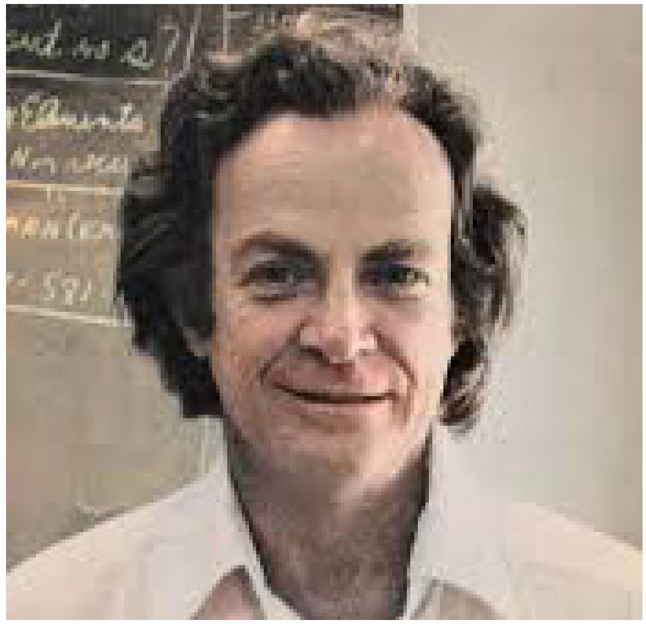
রিচার্ড ফাইনম্যান

সমস্যাটি আকর্ষণ করেছে, কিন্তু বহু প্রচেষ্টাতেও ঐ গাণিতিক সমস্যাটির সমাধান মেলেনি।

এখন আমরা জানি, শেষ পর্যন্ত গত শতাব্দীর একেবারে শেষে 1994–1995 সাল নাগাদ ফার্মার এই অতি প্রসিদ্ধ শেষ উপপাদ্যের সমাধান নির্ণয় করেন ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী অ্যান্ড্রু ওয়াইলস। ওয়াইলস সেই সময় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তারও প্রথম প্রয়াসে কিছু ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। পরে তিনি সেটি সংশোধন করেন। তার এই অবদানের জন্য তিনি পেয়েছেন গণিতের এক অতি উচ্চ সন্মান—আবেল প্রাইজ। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন-কানাডিয় গণিতবিদ মঞ্জুল ভার্গব এই অ্যান্ড্রু ওয়াইলসের অধীনে গবেষণা করে পি এইচ ডি লাভ করেছেন।

ফাইনম্যান ও 1729

ফিরে আসা যাক 1729 এর কথায়। 1729 সংখ্যাটিকে নিয়ে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং কিছুটা মজার ঘটনা বলা যাক। এরকম একটি অভিজ্ঞতা নোবেল জয়ী বিখ্যাত মার্কিন বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান তার বিখ্যাত বই ‘Surely You Are Joking Mr। Feynman’ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি ষাটের দশকে এক বছর ব্রাজিলে ছিলেন, সেখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ করেছিলেন। 1728 বা 1729 কে নিয়ে তার অভিজ্ঞতাটি বেশ মজার। “লাকি নাম্বারস” শিরোনামের এই বইয়ের একটি অধ্যায়ে তিনি বলেছেন যে, সেই সময় ব্রাজিলের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি ছোট রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাবার খেতে যাওয়ার অভ্যাস ছিল। প্রায়ই দেখা যেত যে সেখানে তিনিই একমাত্র কাস্টমার, আর তাকে পরিবেশন করার জন্য চারজন ওয়েটার দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে মাঝেমাঝেই উদয় হতেন এক জাপানি ভদ্রলোক, রেস্তোরাঁয় তিনি ঢুকতেন, খদ্দের খুঁজে বেড়াতেন, অ্যাবাকাস বিক্রি করার জন্য। সেখানে যদি আর কোন লোক উপস্থিত না থাকতেন, বা তারা বিষয়টিতে যদি আগ্রহ না দেখাতেন, তাহলে সেই জাপানি ভদ্রলোক চেষ্টা করতেন ওয়েটারদের তার অ্যাবাকাসের মাহাত্ম্য বোঝাতে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে, পকেট ক্যালকুলেটারের যুগও তখন শুরু হয় নি।

তিনি হয়ত একটা যোগ বা বিয়োগ তাদের করতে দিয়ে দেখাতেন যে, তার সেই অ্যাবাকাস কত দ্রুত সেই কাজ করতে পারে এবং তা কীভাবে মানুষকে পিছনে ফেলে দেয়। আর সেটাই হত তার অ্যাবাকাসের ক্ষমতার বিজ্ঞাপন। ওয়েটারদের তিনি অঙ্ক দিতেন আর তারপরই তার অ্যাবাকাস দিয়ে তার দ্রুত সমাধান করে দিয়ে সম্ভাব্য খরিদ্দারদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। কিন্তু রোজ রোজ বোকা বনতে কারই বা ভাল লাগে? তাই তারা একদিন সেই জাপানি অ্যাবাকাস বিক্রেতাকে সেখানে লাঞ্চে আসা একমাত্র খরিদ্দারকে (ফাইনম্যান) চ্যালেঞ্জ করতে বলে।

প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রথমে তাদের একটি যোগ প্রতিযোগিতা হল, এবং অ্যাবাকাস সহজেই জিতে গেল। তারপর তারা গুণের কাজ হাতে তুলে নেয়, এবং অ্যাবাকাস আবার জিতে যায়, কিন্তু মানুষ আর যন্ত্র প্রায় কাছাকাছি সময়েই তা শেষ করে। তারপর তারা দীর্ঘ ভাগের চেষ্টা করে, এবং এবার এটি টাই হয়। ফাইনম্যান বুঝতে পারলেন যে, সমস্যাটি যত কঠিন হবে, অ্যাবাকাসের তুলনায় তিনি পেন্সিল এবং কাগজ দিয়ে তত ভালো করতে পারবেন। অবশেষে জাপানি লোকটি “রাইওস কিউবিকোস!” বলে এক আহবান করে... ফাইনম্যানকে একটি সংখ্যার ঘনমূলের নির্ণয়ের জন্য চ্যালেঞ্জ জানাতে চাইলেন।

ফাইনম্যান লিখেছেন যে, লোকটি একটি কাগজের টুকরোতে “যে কোনো পুরনো সংখ্যা” লিখে রেখেছিলেন,

এবং তিনি এখনও সংখ্যাটি মনে রেখেছেন... 1729.03। বিক্রেতা তার অ্যাবাকাসে প্রচণ্ডভাবে কাজ শুরু করেন, কিন্তু ফাইনম্যান সেখানে বসে শুধু হাসতে থাকেন এবং উত্তরটা বলে দেন, "12.002..."। হোটেলের ওয়েটারেরা অ্যাবাকাস বিক্রেতার কোণঠাসা অবস্থা দেখে খুব আনন্দিত হলেন, কারণ সেই বিক্রেতা তাদের নিয়মিত বুদ্ধু বানিয়ে আনন্দ পেয়েছেন। অ্যাবাকাস বিক্রেতা বিরক্ত হয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যান।

ওয়েটাররা ফাইনম্যানের গণনার দক্ষতায় অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এই ঘটনার ব্যাখ্যা হিসেবে ফাইনম্যান বলেছেন যে, তার স্মৃতিতে 1728 সংখ্যাটিকে তিনি বিশেষভাবে ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু কেন? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, এফ পি এস বা ব্রিটিশ মাপ-জোকের পদ্ধতি ব্যবহার করলে এক ঘনফুট একটি বহুল ব্যবহৃত পরিচিত একক আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজও রোজকার জীবনে সেই এককই ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। তাই এক ঘনফুট মানে অর্থাৎ $12 \times 12 \times 12$ ঘন ইঞ্চি বা 1728 ঘন ইঞ্চি অনেকের কাছেই এক পরিচিত ব্যাপার। সুতরাং 1728 বেশ মনে রাখার মত এক সংখ্যা।

ফাইনম্যান ব্যাখ্যা করেন যে তিনি ঘটনাক্রমে মনে করেছিলেন, যে এক ঘনফুটে 1728 ঘন ইঞ্চি থাকে, তাই 1729 এর ঘনমূল অবশ্যই 12 এর চেয়ে সামান্য বড় হতে হবে। তারপর তাকে কেবল অতিরিক্ত 1.03 হিসাব করতে হয়েছিল। এটি করার জন্য তিনি 0.03 উপেক্ষা করেছিলেন এবং দ্বিপদী সম্প্রসারণ ব্যবহার করেছিলেন।

$$(1728+1)^{1/3} = 12\left(1+\frac{1}{1728}\right)^{1/3} = 12\left[1+\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1728}\right)+\ldots\right]$$

তাই 1729 এর ঘনমূল 12 অতিক্রম করলে তার পরিমাণ প্রায় 4/1728 বা 1/432। আমরা 1000 এর মধ্যে মাত্র দু'বার 432 পাওয়া যাবে, তাই প্রথম অ-শূন্য (non-zero) সংখ্যাটি 2, বাকি 136 রেখে, এবং আরেকটি শূন্য নামিয়ে আনলে আমরা জানি যে 1360 এ তিনটি 432 আছে, তাই পরবর্তী সংখ্যাটি 3, ইত্যাদি। এটি 12.0023 দেয়।।।

ফাইনম্যান একটি আপাতদৃষ্টিতে কঠিন মানসিক গণনা করলেন ঠিকই, কিন্তু তার পিছনে যতটা না স্মৃতিনির্ভরতা রয়েছে তার থেকে অনেক বেশি রয়েছে লব্ধ জ্ঞানের বিশ্লেষণমূলক প্রয়োগ। ফাইনম্যান অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, কিছুটা আকস্মিকভাবে ঐ সংখ্যাটি পেয়ে যাওয়ায় তার সুবিধা হয়েছে। তার কাছ থেকে আমরা আরও জানতে পারি যে, আর এক নোবেলজয়ী পদার্থবিদ হ্যান্স বেথে এর মধ্যে এই ক্ষমতা ছিল আরও বেশি। মানসিক গণনায় তার দক্ষতা ছিল আরও উচ্চমানের। ফাইনম্যানের মতে, "এটি তার জন্য সহজ ছিল—প্রতিটি সংখ্যা এমন কিছুর কাছাকাছি ছিল যা তিনি জানতেন"। সংখ্যার সঙ্গে কিছু মানুষের নিবিড় যোগ প্রায় গল্পের মত শোনায়। সংখ্যার সঙ্গে এই নিবিড় যোগ ছিল স্বল্পায়ু গণিত-প্রতিভা শ্রীনিবাসন রামানুজনের মধ্যেও।

শেষের কথা

সবশেষে বলা উচিত, ফার্মার সময়ের প্রায় এক'শ বছর পরে সুইস গণিতজ্ঞ লিওনার্ড অয়লার তার একটি বিশেষ ধরণের গাণিতিক বিশ্লেষণে এক বিশেষ শ্রেণির সংখ্যা পান, যেখানে 1729 একটি সদস্য হিসেবে রয়েছে। এগুলিকে বলা হয় ছদ্ম মৌলিক সংখ্যা। আবার একেবারে ভিন্ন ধরণের ধর্ম সম্পন্ন কিছু সংখ্যার হদিশ বিভিন্ন সময়ে পান কয়েকজন গণিতজ্ঞ। তবে সেই সংখ্যাগুলির নাম হয়েছে মার্কিন গণিতজ্ঞ রবার্ট ড্যানিয়েল কারমাইকেল নামানুসারে 'কারমাইকেল নাম্বার'। সেই সংখ্যগোষ্ঠীর মধ্যেও রয়েছে এই 1729। তাই কখনও কখনও 1729 কে একটি কারমাইকেল সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 1729 এর এই বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনাগুলি বর্তমান পরিসরে করা সম্ভব নয়। তবে আরও একবার বলা যাক, 1729 সংখ্যাটির রয়েছে একটি বর্ণময় ইতিহাস, যেখানে জড়িয়ে রয়েছে পিয়ের দ্য ফার্মা, বার্নার্ড ফ্রেনিকল দ্য বেসি, লিওনার্ড অয়লার, জি এইচ হার্ডি এবং অবশ্যই শ্রীনিবাস রামানুজনের মত অতি বড় গণিতজ্ঞদের নাম। তা যে সংখ্যাগোষ্ঠীর দলেই 1729 পড়ে যাক না কেন তার এক অনন্য স্থান রয়েছে গণিতের জগতে। ◆

রবার্ট ড্যানিয়েল কারমাইকেল

*লেখক ডঃ **ভূপতি চক্রবর্তী** কলকাতার সিটি কলেজের পদার্থবিদ্যার প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: chakrabhu@gmail।com

প্লাস্টিক দুষণ থেকে পরিত্রাণের খোঁজে

দীপাঞ্জন ঘোষ

এ কথা অনস্বীকার্য যে, গত শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতির ফলে মানুষের পক্ষে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করা সহজতর হয়েছে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নিত্যনতুন জিনিসের জন্ম দিয়েছে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যার গুরুত্ব সীমাহীন। এই রকমই একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিস্ময়কর উদ্ভাবন হল ‘প্লাস্টিক’। আমাদের সমাজের প্রতিটি কোণে অর্থাৎ গার্হস্থ্য, কৃষি, শিল্প, পরিবহন, নির্মাণ, ওষুধ, খেলাধুলা, বিনোদন থেকে শুরু করে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, মহাকাশ প্রযুক্তি, ইন্টারনেট পরিষেবা ইত্যাদি সর্বত্র প্লাস্টিকের ব্যাপ্তি ত্বরান্বিত হয়েছে। কিন্তু আলোকিত প্রদীপের নিচে যেমন অন্ধকার থাকে, তেমনি প্লাস্টিক দূষণ বর্তমান সময়ের অন্যতম উদ্বেগজনক সমস্যা। আবর্জনা হিসাবে প্লাস্টিকের দীর্ঘ স্থায়িত্ব আছে। তাছাড়া, প্লাস্টিক ও প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের ব্যবহার যেভাবে আমাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে, মনে হয় একদিন প্লাস্টিকের আবর্জনা এই সভ্যতাকে গ্রাস করে ফেলবে।

প্লাস্টিক আসলে কী?

অনেকগুলো ছোট ছোট অণু বা পুনরাবৃত্তিমূলক গাঠনিক একক (Monomer) একসাথে যুক্ত হয়ে যখন একটি বৃহৎ অণু (Macromolecule) গঠন করে, তাকে পলিমার (Polymer) বলে। গ্রীক ভাষায়, ‘*Poly*’ শব্দের অর্থ ‘অনেক’ এবং ‘*meros*’ শব্দের অর্থ ‘অংশ’। জনস জ্যাকব বারজেলিয়াস 1833 সালে ‘পলিমার’ শব্দটির প্রচলন করেন। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন ধরণের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উভয় প্রকারের যৌগ পলিমার শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং, ব্যাপক অর্থে সিল্ক, উল, তুলো, পাট, রাবার, লাক্ষা বা গালা ইত্যাদি সমস্ত প্রাকৃতিক বস্তুই পলিমার। আবার, প্লাস্টিক সংশ্লেষিত বা আধা-সংশ্লেষিত উচ্চ আণবিক ভর সম্পন্ন এক ধরণের কৃত্রিম বা আংশিকভাবে প্রাকৃতিক জৈব পলিমার, যা প্রধানত জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে রাসায়নিকভাবে তৈরী করা হয়। আজকাল ‘পলিমার’ শব্দটি মূলত প্লাস্টিককে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। যখন কোন পদার্থের ওপর বাইরে থেকে কোন বল বা শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তখন তার আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন তাপ দিলে ধাতুর প্রসারণ হয়। কিন্তু বাইরে থেকে প্রযুক্ত বল বা শক্তি অপসারণ করলে যদি পদার্থটি সম্পূর্ণভাবে আগের অবস্থায় ফিরে আসে, তাকে বলে ইলাস্টিক; আর যদি প্রযুক্ত বল বা শক্তি অপসারণ করলেও পদার্থটি পরিবর্তিত আকার ও আকৃতিতেই থেকে যায়, তখন তাকে বলে প্লাস্টিক। পৃথিবীতে কোন পদার্থই 100% ইলাস্টিক বা প্লাস্টিক নয়। সম্ভবত পলিমারগুলির মধ্যে অনেকাংশে প্লাস্টিসিটি ধর্ম বা পরিবর্তিত আকৃতি ধরে রাখার প্রবণতার জন্যই এদের এই নামকরণ।

ইংরেজ প্রযুক্তিবিদ আলেকজান্ডার পার্কেস 1862 সালে সর্ব প্রথম মানব-সৃষ্ট প্লাস্টিক ‘পার্কেসিন’ (Parkesine) আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে বেলজিয়ান রসায়নবিদ লিও হেনড্রিক বেকল্যান্ড 1907 সালে ব্যবসায়িকভাবে সফল সম্পূর্ণ রূপে সংশ্লেষিত প্লাস্টিক ‘বেকেলাইট’ (Bakelite) আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথম ‘প্লাস্টিক’ শব্দটি ব্যবহার করেন।

প্লাস্টিক মূলত কার্বন এবং হাইড্রোজেন সহযোগে গঠিত বস্তু। তবে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিন, সালফার, এমনকি সিলিকনও থাকে প্লাস্টিকে। কখনও কখনও কিছু অন্যান্য পদার্থও প্লাস্টিক তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত, যে কোন প্লাস্টিককে চাপ বা তাপ দিয়ে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করা যায় এবং বাঁকানোর সময় ভেঙ্গে যায় না।

চিত্র 1: আজকাল জল ধরে রাখার কাজে বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিকের পাত্র ব্যবহৃত হয়।

প্লাস্টিককে প্রধানত থার্মোপ্লাস্টিক (Thermoplastics) এবং থার্মোসেটিং পলিমার (Thermosetting Polymers)—এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। থার্মোপ্লাস্টিকগুলির মধ্যে পলিথিন (Polyethene), পলিস্টাইরিন (Polystyrene), পলিভিনাইল ক্লোরাইড (Polyvinyl Chloride) এবং পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন (Polytetrafluoro-ethylene) অন্যতম। থার্মোপ্লাস্টিক তাপ ভঙ্গুর (Thermolabile) যৌগ, অর্থাৎ যদি যথেষ্ট তাপ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে এগুলি নরম হয়ে গলে যাবে। অন্যদিকে, থার্মোসেট তাপ স্থিতিশীল (Heat-stable) যৌগ, অর্থাৎ উত্তপ্ত করলে গলে গিয়ে নির্দিষ্ট আকার নেওয়ার পর শক্ত হয়ে যায়।

প্লাস্টিক সর্বত্র বিরাজমান

একদিকে যেমন, সহজেই ছাঁচে ঢেলে আকৃতি দান করা যায়, অন্যদিকে আবার হালকা অথচ মজবুত, টেকসই এবং তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট সস্তা হওয়ার কারণে আবিষ্কারের পর থেকেই জনমানসে প্লাস্টিকের চাহিদা আকাশছোঁয়া। নানা গুণাবলীর সাহায্য নিয়ে প্লাস্টিক ধাপে ধাপে আমাদের জীবনযাত্রায়, এমনকি সমাজের প্রতিটি স্তরে ঢুকে পড়েছে। আজ বলপেন থেকে চুড়ি, ফ্রিজ থেকে জলের ফিল্টার, বালতি থেকে থার্মোওয়ার (Thermoware) পর্যন্ত সব কিছুতেই প্লাস্টিকের (চিত্র 1) উজ্জ্বল উপস্থিতি। প্লাস্টিক আমাদের গার্হস্থ্য জীবনকে সহজ, উন্নত এবং সুখী করেছে। প্রতিদিন লাখ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় প্লাস্টিক। মুদির দোকানের মালপত্র থেকে জলের বোতল; আবার তেল থেকে বাগানের সতেজ সবজি, সবই প্লাস্টিকে মোড়ানো অবস্থায় মানুষের হাতে শোভাবর্ধন করে। পলিস্টাইরিন থেকে তৈরী চিরুনি, বোতাম, ছাতার বাঁট, বাচ্চাদের খেলনা এবং আরও অনেক কিছু তৈরী হয়। অন্যদিকে, ভিনাইল ক্লোরাইড থেকে তৈরী হয় কলের পাইপ, ঘরের পার্টিশন, দরজা-জানালা, ফ্লোর ম্যাট, জুতোর সোল, রেইন কোট, কম্পিউটার এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির পার্টস ও কেস ইত্যাদি আরও নানান জিনিস। সেইসঙ্গে বৈদ্যুতিক তারের শক-নিরোধক আবরণ তৈরির জন্য ভিনাইল ক্লোরাইড ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ভিনাইল ক্লোরাইডে জৈব থ্যালেটস এবং ফসফেট যোগ করে একটি খুব নরম PVC তৈরী করা হয়, যা খাবার প্যাকেজিং, সফ্ট টয়, এমনকি পোশাক (চিত্র 2) প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। আবার, দ্রুতগতির বাইক ও গাড়ির বডি পার্টস তৈরীর জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী, ঘাত-প্রশমক এবং ইলাস্টিক প্রকৃতির প্লাস্টিক বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহার চিকিৎসা ব্যবস্থায় রীতিমত বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে। প্লাস্টিক চিকিৎসা পদ্ধতিকে সহজ করে তুলেছে এবং এর ফলে রোগীদের নিরাপত্তাও অনেক খানি বেড়েছে। বিপুল সংখ্যক চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি যেমন, ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, রক্তের পাউচ, ইউরোব্যাগ, ইন্ট্রাভেনাস টিউব, ক্যাথেটার, সার্জিক্যাল গ্লাভস, কার্ডিয়াক ভালভ, নিতম্ব এবং হাঁটুর জয়েন্ট, ভাঙা হাড়ের জন্য

চিত্র 2: আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়।

চিত্র 3: চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অধিকাংশই প্লাস্টিক থেকে তৈরী হয়।

PVC প্লেট, কৃত্রিম অঙ্গ ইত্যাদি প্লাস্টিক (চিত্র 3) দিয়ে তৈরি। এই সমস্ত উপকরণগুলিতে ব্যবহৃত প্লাস্টিক পলিমারগুলি কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত। অর্থাৎ, এইগুলি রোগীদের রক্ত এবং দেহতরলের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে না। তাছাড়া, এই সমস্ত উপকরণ সস্তা, মরিচা-মুক্ত, সহজে ভাঙে না এবং নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির অর্থাৎ সহজে বিক্রিয়া করে না।

বর্তমানে পরিকাঠামো, নির্মাণ, কৃষি, ভোগ্যপণ্য, প্যাকেজিং ইত্যাদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সকল ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহার বিষয়ে আমরা সকলেই অবগত আছি। প্লাস্টিক প্রযুক্তির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি নতুন উদ্ভাবনে আশা জাগিয়েছে। সম্প্রতি এমন এক ধরনের প্লাস্টিক তৈরী করা সম্ভব হয়েছে, যা অনেক বেশি জল ধরে রাখতে পারে। শিশুদের ডায়াপার তৈরীতে এই জাতীয় প্লাস্টিক পলিমারগুলি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া, এই নতুন উদ্ভাবন মরুভূমিতে চাষাবাদের সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করেছে। এই পলিমার ব্যবহার করে গাছের গোড়ায় ফোঁটা ফোঁটা জল দিয়ে ফসল উৎপাদনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হয়েছে। বৈদ্যুতিক এবং টেলিযোগাযোগ শিল্পে প্লাস্টিক ব্যবহারের ফলে আদ্যিকালের ধাতব তারগুলি অপটিক্যাল ফাইবার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এমনকি বিদ্যুৎ-পরিবাহী প্লাস্টিকও আবিষ্কৃত হয়েছে। দেখা গেছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই প্লাস্টিকের পরিবাহী ক্ষমতা তামার তারের চেয়েও বেশি।

প্লাস্টিক থেকে দূষণ

বর্তমান সময়ে বহুমুখী ব্যবহারের দৌলতে পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর প্লাস্টিকের একটা তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বেশিরভাগ জীবাশ্ম জ্বালানি-জাত প্লাস্টিক অভঙ্গুর (Non-biodegradable) প্রকৃতির হয়ে থাকে। আবার এখনকার 'ছুঁড়ে ফেলা সংস্কৃতির' অঙ্গ হিসাবে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বর্জ্য প্লাস্টিক আবর্জনায় পরিণত হয় (সারণী 1)। প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার, মানুষের মধ্যে সুস্থ নাগরিক বোধের অভাব, সরকারের উদাসীনতা ইত্যাদি নানা কারণে এই আবর্জনার একটি বড় অংশ মাটিতে পড়ে থাকে, নয়তো খোলা নর্দমায় স্তূপীকৃত অবস্থায় জলধারার গতিরোধ করে বা ভাগাড়ে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে জমতে থাকে (চিত্র 4)। বর্জ্য প্লাস্টিক শহরের রাস্তা, পার্ক, বাগান, বাজার, স্কুল-কলেজ, নদীর তীর, সমুদ্র উপকূল, এমনকি পাহাড় বা অন্যান্য পর্যটন স্থানেও পরিলক্ষিত হয়। অসতর্কভাবে যত্রতত্র ছুঁড়ে ফেলা প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, থালা, বাটি, গ্লাস ইত্যাদি নর্দমার জলের স্বাভাবিক গতিকে অবরুদ্ধ করে, বর্ষার সময়ে

চিত্র 4: আবর্জনার স্তূপে প্লাস্টিকের আধিপত্য একটি দৃষ্টিকটু এবং অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি প্রকাশ করে।

সারণী 1: বর্জ্য প্লাস্টিক উৎপাদনের উৎস	
গৃহস্থবাড়ি	ক্যারি ব্যাগ, বোতল, পাত্র বা বয়াম, গার্বেজ ব্যাগ।
স্বাস্থ্য পরিষেবা	ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ, গ্লুকোজের বোতল, রক্তের পাউচ ও ইউরোব্যাগ, ইন্ট্রাভেনাস টিউব, ক্যাথিটার এবং সার্জিক্যাল গ্লাভস।
হোটেল এবং ক্যাটারিং	প্যাকেজিং দ্রব্যাদি, মিনারেল ওয়াটার বোতল, প্লাষ্টিক প্লেট, গ্লাস, চামচ।
বিমান/ট্রেন ভ্রমণ	মিনারেল ওয়াটার বোতল, প্লাষ্টিক প্লেট, গ্লাস, চামচ, প্লাস্টিক ব্যাগ।

মাটির ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করে দিয়ে ভূগর্ভস্থ জলের পুনঃবিতরণে (Recharge) সমস্যার সৃষ্টি করে। জল নিকাশি ব্যবস্থায় বাধা সৃষ্টির কারণে শুধু যে নর্দমা রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বৃদ্ধি পায় তাই নয়, চারিদিকে একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়, যার ফলে জলবাহিত রোগ ছড়ানোর ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। প্লাস্টিক মাটির মধ্যে থাকা জীবাণুর কার্যকলাপে ব্যাঘাত ঘটায়, যার দরুন শেষ পর্যন্ত মাটির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়া, গবাদি পশুদের শ্বাসরোধের ঝুঁকিও বাড়িয়ে তোলে। কারণ, বেশ কয়েক ধরণের প্রাণী খাওয়ার সময় ভুলবশত প্লাস্টিকের ব্যাগ বা অন্যান্য জিনিস খেয়ে ফেলে।

গুপ্তঘাতক মাইক্রোপ্লাস্টিক

সম্প্রতি প্লাস্টিক দূষণকে রীতিমত চিন্তার কারণে পরিণত করেছে যথাক্রমে মাইক্রোপ্লাস্টিক (Microplastic) এবং ন্যানোপ্লাস্টিক (Nanoplastic) নামের দু'টি পদার্থ। সহজ ভাবে বললে, 5 মিলিমিটারের কম ব্যাসের প্লাস্টিক কণাকে 'মাইক্রোপ্লাস্টিক' এবং 1,000 ন্যানোমিটারের কম ব্যাসের সূক্ষ্ম প্লাস্টিকের কণাকে 'ন্যানোপ্লাস্টিক' বলে। প্লাস্টিকের সামগ্রী উৎপাদনের সময় ঠিকমত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না হওয়ায় এই ধরনের তথাকথিত খুদে দূষক তৈরি হয়, যা পরিবেশে দীর্ঘমেয়াদি থাকে এবং আমাদের বড় সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়। সাধারণত, খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে, শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা এবং ত্বকের সংস্পর্শে এলে আমাদের দেহে মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রবেশ করতে পারে। মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রভাবে দেহে মুক্ত মূলক এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মধ্যে অসাম্য বা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস (Oxidiative stress), DNA-র ক্ষতি থেকে শুরু করে দেহের নানা অঙ্গের সমস্যা, ইত্যাদি তৈরী হতে পারে।

সমুদ্রে ভাসমান প্লাস্টিক বর্জ্য সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে ভেঙে গিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিকে পরিণত হয়। বর্তমানে প্রায় 51 ট্রিলিয়ন মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা (চিত্র: 5) সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রতি কিলোগ্রাম সামুদ্রিক লবণে 1653 ± 29 টির মত মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা থাকে। সমুদ্রের জলে উপস্থিত প্ল্যাঙ্কটন-

চিত্র 5: সমুদ্রের জলে ভাসমান মাইক্রোপ্লাস্টিক।

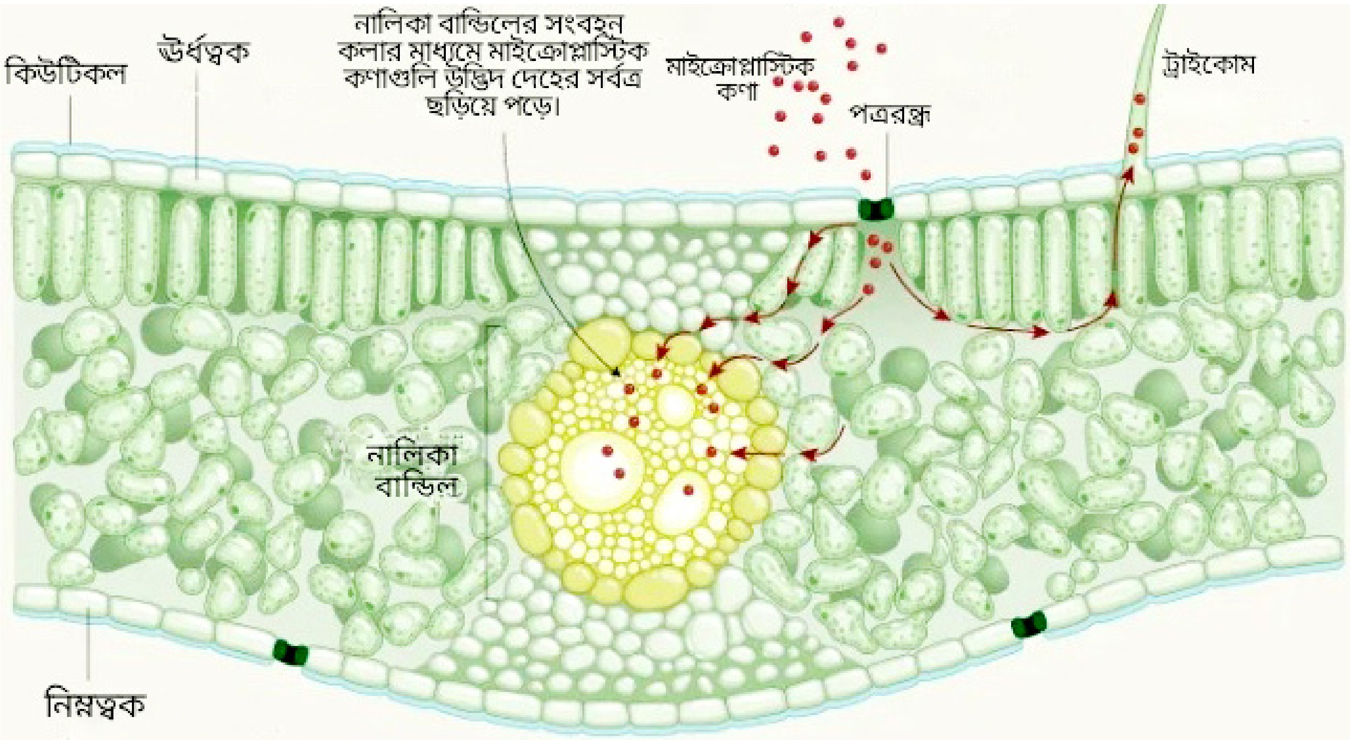

চিত্র 6: একটি দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পাতার প্রস্থচ্ছেদে উদ্ভিদ দেহে মাইক্রোপ্লাস্টিকের প্রবেশ পথ দেখানো হয়েছে (*সৌজন্যে: উইলি পেইজেনবার্গ এবং নেচার*)।

জাতীয় জীবগুলি মাইক্রোপ্লাস্টিককে ভুলবশত খাবার হিসেবে গ্রহণ করে। এই সমস্ত অতি ক্ষুদ্র জীবকে এরপর ধীরে ধীরে ছোট মাছে খায়। ছোট মাছগুলিকে আবার বড় মাছে খায়। এই ভাবে খাদ্য শৃঙ্খলের কাজ কর্ম এগিয়ে চলে। এক সময় খাদ্য শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতায় মাইক্রোপ্লাস্টিকগুলি মানব শরীরে ঢুকে পড়ে। নানা প্রাণীর দেহে ঘুরে শেষ পর্যন্ত মানুষের শরীরে প্রবেশ করলেও কোন প্রাণীর পাকস্থলীতে মাইক্রোপ্লাস্টিক হজম হয় না । প্লাস্টিক বা মাইক্রোপ্লাস্টিক প্রাণীদের গলায় আটকে গিয়ে প্রাণীরা মারাও যাচ্ছে। বর্তমানে অনেক বোতলজাত পানীয় ও কসমেটিকসেও পাওয়া যাচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। এছাড়া পলিয়েস্টার, নাইলন প্রভৃতিতেও মাইক্রোপ্লাস্টিকের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে।

এইভাবে প্রতিনিয়ত পরিবেশের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। ফলস্বরূপ, বিরূপ প্রভাব পড়েছে জীবজগতের ওপর। নষ্ট হয়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক জীববৈচিত্র্য। হরমোন ক্ষরণে তারতম্য, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস কিংবা ক্যান্সারের মত মারাত্মক সব শারীরিক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে মাইক্রোপ্লাস্টিক। বিজ্ঞানীদের দাবি মস্তিষ্ক, ফুসফুস, রক্ত এবং অমরা সহ বিভিন্ন মানব অঙ্গে এবং কলায় মাইক্রোপ্লাস্টিকের উপস্থিতি উদ্বেগজনক। খাদ্য শৃঙ্খলে প্রবেশকারী প্লাস্টিকের সাধারণ উৎস হিসাবে মাটি এবং জলের কথা আগে থাকতেই জানা ছিল। সম্প্রতি বিখ্যাত 'নেচার' জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে যে, বাতাসেও মাইক্রোপ্লাস্টিক ভেসে বেড়াচ্ছে। গাছের পাতার পত্ররন্ধ্র (চিত্র 6) সালোকসংশ্লেষ বা শ্বসনের কাজে খোলা থাকার সুবাদে মাইক্রোপ্লাস্টিক পাতায় প্রবেশ করে সংবহন কলার মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেহে, এমনকি গাছের সঞ্চয়ী অঙ্গে। তাই সতেজ শাকসবজি এবং ফলমূল কতটা মাইক্রোপ্লাস্টিক দ্বারা কলুষিত, তা জানার জন্য আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

বিপদের গন্ধ

সাধারণ প্লাস্টিকের দূষণ বন্য জীবজন্তু এবং মানুষ উভয়েরই প্রজনন সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রচলিত প্লাস্টিকের দূষণের কারণে মানুষের শুক্রাণুর সংখ্যা এবং গুণমান হ্রাস পায়, যৌনাঙ্গের অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং স্তন ক্যান্সারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। প্লাস্টিকের মধ্যে থাকা বিষাক্ত উপজাত ডাইঅক্সিন (Dioxin) একটি ক্যান্সার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থ, যা স্তন্যদানকারী মায়ের থেকে শিশুর দেহে প্রবেশ করে বলে মনে করা হয়। প্লাস্টিক বিশেষ করে PVC দহনের ফলে ডাইঅক্সিনের পাশাপাশি ফুরান (Furan) নামের ওপর একটি বিষাক্ত যৌগ বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়। PVC পোড়ানোর দরুন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (Hydrogen chloride) যৌগটি তৈরী হয়। যেহেতু, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড সহজেই বাতাসের জলীয় বাষ্পের সঙ্গে একত্রিত হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করে, তাই PVC পোড়ানো মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উভয়ের জন্যই খুব ক্ষতিকর। সম্ভবত একই কারণে, সংরক্ষণাগারে রুপোর গয়না, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম বা কাগজের দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণের জন্য PVC নির্মিত কোন দ্রব্যাদির সুপারিশ করা হয় না।

কারখানায় উৎপাদনের সময় অ্যাডিপেটস (Adipates),

থ্যালেটস (Phthalates) ইত্যাদি কয়েক রকম এস্টার যৌগ প্লাস্টিকের নমনীয়তা, স্বচ্ছতা, স্থায়িত্ব এবং দীর্ঘায়ু বৃদ্ধির জন্য যোগ করা হয়। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে, পলিইথিলিন টেরেথ্যালেট (Polyethylene terephthalate বা PET) দিয়ে তৈরি জার বা বোতলের পুনঃব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে। PET সময়ের সাথে সাথে ভেঙ্গে যায় এবং বোতলগুলি পুনরায় ব্যবহার করার সময় বোতলের গা থেকে জল বা পানীয়ের মধ্যে থ্যালেট এবং অ্যান্টিমনি (Sb) বেরিয়ে আসতে থাকে। পুনঃব্যবহৃত PET জার বা বোতলে রাখা পানীয়ের নমুনায় DEHA বা ডাই(2-ইথাইলহেক্সাইল)অ্যাডিপেট নামের অপর একটি ক্ষতিকারক যৌগের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। DEHA যকৃতের সংক্রমণ, লিউকেমিয়া, অন্তঃক্ষরা তন্ত্রের স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা দান এবং সম্ভাব্য প্রজননিক সমস্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়।

অন্যদিকে, মাইক্রোপ্লাস্টিকে থাকা রাসায়নিক পদার্থগুলি রক্তে মিশে যাওয়ার পর একে একে শরীরের অনেক অঙ্গের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিতে শুরু করে। সেই সঙ্গে নানান ধরণের সংক্রমনের আশঙ্কাও বহুগুন বৃদ্ধি পায়। প্যাকেটজাত লবণ ও চিনির মধ্যে মাইক্রোপ্লাস্টিক থাকে। আর এই মাইক্রোপ্লাস্টিকে উপস্থিত আর্সেনিক (As), অ্যালুমিনিয়াম (Al) শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এছাড়া, মাইক্রোপ্লাস্টিকে লুকিয়ে থাকে জেনোস্ট্রজেন (Xenoestrogen) নামের বিষ, যা নারী হরমোন ইস্ট্রোজেনের স্বাভাবিক ক্ষরণকে প্রভাবিত করে দেহে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে।

রেহাই পাওয়ার উপায় খোঁজা

এত কিছু সমস্যার পর ও বলতে হয় যে, প্লাস্টিক সাধারণত বিষাক্ত পদার্থ নয়, কিন্তু প্লাস্টিকের অ-ভঙ্গুর প্রকৃতি পরিবেশে দূষণ সৃষ্টি করে। প্লাস্টিক থেকে সৃষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অন্তর্ধুম দহন অথবা পুনর্ব্যবহারই একমাত্র সম্ভাব্য বিকল্প বলে অনেকে মনে করেন। উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য পরিবেশ-বান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে এবং সেই মত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তবে দেরিতে হলেও প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতও পিছিয়ে নেই। প্লাস্টিকজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, বর্জ্য সংগ্রহকারী, বর্জ্য বিক্রেতা এবং পুনর্ব্যবহারকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের জন্য একটি দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক গত এক দশক বা তারও বেশি সময় ধরে সারা দেশে গড়ে উঠেছে। বর্তমানে আমাদের দেশে উৎপন্ন প্লাস্টিক বর্জ্যের 50–70 শতাংশেরও বেশি পুনর্ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন প্লাস্টিক পণ্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

অতি সম্প্রতি, বিজ্ঞানীরা প্লাস্টিক ভেঙ্গে ফেলার অসাধারণ ক্ষমতা সহ বেশ কয়েকটি প্রজাতির ছত্রাক শনাক্ত করেছেন, যা বর্তমান কালের সবচেয়ে চিন্তা উদ্রেককারী পরিবেশগত সমস্যার একটি সম্ভাব্য সমাধান প্রদান করবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা আমাজনের গভীর জঙ্গলে *Pestalotiopsis microspora* নামক একটি বিরল ছত্রাকের সন্ধান পেয়েছেন,

চিত্র 7: প্লাষ্টিক দুষণের ওপর একটি পরিচিত দৃশ্য

যা পলিইউরেথেন (Polyurethane) জাতীয় প্লাস্টিক হজম করতে পারে, এমনকি মাটির গভীরে অক্সিজেন-মুক্ত পরিবেশেও। এই ছত্রাকটি বিশেষ উৎসেচকের দ্বারা প্লাস্টিককে সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে ফেলে জৈব পদার্থে রূপান্তরিত করে। *Parengyodontium album* নামের অপর একটি ছত্রাকের খোঁজ মিলেছে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ভাসমান প্লাস্টিক বর্জ্যের স্তূপে। এই ছত্রাকটি শুধুমাত্র এই দূষিত পরিবেশে টিঁকে থাকে না, এটি পলিথিনকে খেয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে। মনে রাখতে হবে যে, সাগরে দূষণকারী পদার্থের সিংহভাগ এই পলিথিন জাতীয় প্লাস্টিক।

শেষ কথা

এখন প্রশ্ন হল, প্লাস্টিক দূষণের (চিত্র 7) মোকাবিলা কীভাবে করা যায়? প্লাস্টিকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন বা সামাজিকভাবে প্লাস্টিক বর্জন কোন যে স্থায়ী সমাধান নয়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্লাস্টিকের তৈরী দ্রব্যগুলি ব্যবহারের পরে ফেলে না দিয়ে, আমরা পুনর্ব্যবহারের মাধ্যমে কাজে লাগাতে পারি। যদিও রঞ্জক কণা বা অন্যান্য পদার্থ মিশে থাকার কারণে সব ধরণের প্লাস্টিককে পুনর্ব্যবহার বা পুড়িয়ে ফেলা যায় না। আবার, প্লাস্টিক পোড়ানো মানব স্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। তাহলে সমাধান কি? একটা পথ হল, বাণিজ্যিকভাবে পরিবেশ বান্ধব জৈব ভঙ্গুর প্লাস্টিক তৈরী করা ও ব্যবহার বাড়ানো। তাই বর্তমানে সুস্থ জীবনযাপন ও স্বাভাবিক পরিবেশ গঠন করতে চাইলে আমাদের প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে হবে, প্যাকেটজাত দ্রব্যের পরিমাণ কমাতে হবে এবং প্লাস্টিকের বদলে পরিবেশ বান্ধব দ্রব্য, যেমন ফাইবার, কাগজ ইত্যাদির গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে হবে, জল ফিল্টার অর্থাৎ রিভার্স অসমোসিস করে পান করতে হবে, যার ফলে প্লাস্টিকের থেকে ক্ষতির আশঙ্কা অনেকটা কমে যাবে। ◆

*লেখক **শ্রী দীপাঞ্জন ঘোষ** বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক, পত্রিকা সম্পাদক এবং লোকবিজ্ঞান প্রচারক।*
ইমেল: dpanjanghosh@gmail।com

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, না কি বিজ্ঞান-সাহিত্যিক?

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

'আপনারা তো বড় যুদ্ধের কথা শুনেছেন, কিন্তু আমি বলব অনেকেই পিঁপড়ের যুদ্ধ দেখেন নি। হাজার হাজার পিঁপড়ের সে কী ভীষণ যুদ্ধ ঘটেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে এই কলকাতার আশেপাশে, সোনারপুরের একটি বাগানে, 1934 খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল বৈকালে এবং চলেছিল প্রায় দুইদিন। হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল এই যুদ্ধে। সত্যই তাদের যুদ্ধে নিপুণতা প্রশংসনীয়। যুদ্ধের সময় সৈনিক পিঁপড়েরা শরীরের পশ্চাদদিক থেকে মাঝে মাঝে এক ঝাঁঝালো গ্যাস বের করে দিয়ে শত্রুদের নিস্তেজ করে দিচ্ছিল। গরিলাযুদ্ধ ও হাতাহাতি প্রচন্ড যুদ্ধ তো চলছিলই। যখন বিচক্ষণ সৈনিকেরা আর একটি ফ্রন্ট বা রণাঙ্গন খুলে সেই দিকে ধাবিত হলো তখন দেখা গেল হাজার হাজার লাল পিঁপড়ের মৃতদেহে পূর্বেকার রণভূমি লাল হয়ে উঠেছে। চোখে না দেখলে সে দৃশ্য বিশ্বাস করা যায় না।' এই পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের।

পথেঘাটে যেখানে তিনি যেতেন, সব জায়গায় তাঁর তীক্ষ্ণ কৌতুহলী দৃষ্টি পড়ত। পোকামাকড়রা কোথায় কি করছে, কী খাচ্ছে প্রভৃতি খুঁটিয়ে দেখতেন। পিঁপড়ে, মাকড়সা, প্রজাপতি প্রভৃতি কীট পতঙ্গের স্বভাব, জীবনযাত্রা প্রণালী, বসতি ইত্যাদি বিষয়ে জানবার ব্যাপারে বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কৌতূহল ছিল অপরিসীম। আর হয়তো তাই তাঁর মৌলিক গবেষণা ছিল প্রধানত: মাকড়সা, পিঁপড়ে, প্রজাপতি, শুঁয়োপোকা, মাছ ও ব্যাঙাচি নিয়ে।

পৃথিবীতে কিছু মানুষ 'জন্মান' যাঁরা সারাজীবন ধরেই প্রকৃতির নানা বৈচিত্র, গাছপালা, পশুপাখি, কীটপতঙ্গের রহস্য নিয়ে মেতে থাকেন। এমনি মানুষ ছিলেন চার্লস ডারউইন, জ্যঁা অ্যাঁরি ফ্যাবার, ইউজিন মারে এবং 'আমাদের' গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। আজ আমরা তাঁর কর্মজীবন নিয়ে আলোকপাত করব।

গোপালচন্দ্রের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরের লোনসিংহ গ্রামে, 1895 সালের 1লা আগস্ট। গোপালচন্দ্রের বয়স যখন পাঁচ, তখন তাঁর বাবা মারা যান। চরম আর্থিক অনটনে পড়ে পরিবার। এরই মধ্যে 1913 সালে গ্রামের লোনসিংহ স্কুল থেকে মেধাবী গোপালচন্দ্র জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর নিয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। 1913–15 সালে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে আইএ পড়েন। আর্থিক কারণে পড়া অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে পন্ডিতসার স্কুলে সহকারী শিক্ষকের কাজ নিতে হয়। পন্ডিতসার ও লোনসিংহ স্কুলে শিক্ষকতা (1915–19) করার সময় তিনি ছাত্রদের নিয়ে গাছপালা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে থাকতেন। কৃত্রিম উপায়ে ফুলের পরাগ সঙ্গম ঘটিয়ে সংকর উদ্ভিদ তৈরীর চেষ্টা, কলমের সাহায্যে একই গাছে দুই-তিন রকমের ফুল উৎপাদন করা ছিল পরীক্ষার বিষয়। এরকম একটা সময়, এক বর্ষার সন্ধ্যায় স্কুল বোর্ডিং এর আড্ডায় ভূতের গল্প নিয়ে তর্কের প্রসঙ্গে 'পাঁচির মা'-র ভিটেয় গিয়ে সংগ্রহ করে এনেছিলেন তথাকথিত ভৌতিক আলোর উপকরণসূত্র। 1326-এর পৌষ মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় (ডিসেম্বর, 1919) এই বিষয়ের ওপর প্রকাশ করেন 'পচা গাছপালার আশ্চর্য আলো বিকিরণ করবার ক্ষমতা' নামে একটি প্রবন্ধ। এই লেখাটির ওপর

চোখ পড়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর। তিনি গোপালচন্দ্রের অনুসন্ধিৎসায় আকৃষ্ট হয়ে বসু বিজ্ঞান মন্দির-এর কর্মকাণ্ডে তাঁকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। কাশীপুরের বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের টেলিফোন অপারেটর গোপালচন্দ্র সেই আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেননি।

গোপালচন্দ্রের তিনটি গবেষণা-কাজ আন্তর্জাতিক স্তরের প্রথম সারির। একটি হ'ল—নালসো পিঁপড়ের জীবনচক্র সংক্রান্ত; দ্বিতীয়টি পোকার অপত্যস্নেহ বিষয়ক এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আর একটি- ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙের রূপান্তরে পেনিসিলিনের ভূমিকার ওপর।

গোপালচন্দ্র তাঁর কৌতুহলী ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রকৃতির নানা রহস্য উদঘাটন করেছেন। প্রত্যক্ষ করেছেন কীটপতঙ্গের স্বভাত-চরিত্র। এদের মধ্যে পিঁপড়ের রণকৌশল, শোঁয়াপোকার মৃত্যু অভিযান, মাকড়সার লড়াই, পিঁপড়েদের প্রণয়লীলা, ভীমরুলের রাহাজানি, নেউলে পোকার জন্মরহস্য, কীটপতঙ্গের বাজনা, লুকোচুরি ও শিল্প নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখনীয় আর একটি বিষয় হ'ল, গোপালচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাহিত্য চর্চা। তাঁর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের বহু বিষয় তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবন্ধ আকারে উপস্থাপিত করেছেন। গোপালচন্দ্র তাঁর কর্মজীবনে আটশোর মতো বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচনা করেন। এগুলো সাময়িক প্রত্রিকা- প্রবাসী, কাজের লোক, প্রকৃতি, উদয়ন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান, দেশ, সন্দেশ, শিশুসাথী, যুগান্তর, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়।

বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের প্রথম পর্ব যদি বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমার-রাজেন্দ্রলাল- ত্রৈলোক্যনাথ প্রমুখের প্রয়াসে গড়ে ওঠে, তাহলে দ্বিতীয়পর্বে নিঃসন্দেহে রামেন্দ্রসুন্দর-জগদানন্দ-চারুচন্দ্র-গোপালচন্দ্র প্রমুখের অবদানে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত হয়ে একটি সুস্পষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে। কীটপতঙ্গ ও পশু-পাখি ছাড়াও তিনি আবিস্কারমূলক, স্মৃতিকথামূলক, উদ্ভিদ বিষয়ক ও বিজ্ঞানের সংবাদমূলক ছোট-বড় 22টি বই লিখে গেছেন।

আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত (1948) বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে শুরু থেকেই গোপালচন্দ্র যুক্ত ছিলেন। সুদীর্ঘকাল সামলেছেন পরিষদ প্রকাশিত 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব।

আফসোসের কথা, তাঁর বিজ্ঞান-সাহিত্যচর্চা তথা অবদান নিয়ে আজ অবধি কোনও তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা চোখে পড়ে না। তাহলে কি এটা বলা যায়—বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের মনোযোগী, অনুশীলন-নির্ভর পাঠকই তৈরী করা যায় নি? অথবা বিজ্ঞান-সাহিত্য চর্চার ঐতিহ্যই গড়ে ওঠেনি?

গোপালচন্দ্র 1951-তে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে অনুষ্ঠিত সামাজিক পতঙ্গ বিষয়ক আলোচনা সভায় ভারতীয় শাখা পরিচালনার জন্য আমন্ত্রিত হন, 1968 তে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার; 1974-এ আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্মৃতিফলক; 1975-এ 'বাংলার কীটপতঙ্গ' গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার। জীবনের শেষপ্রান্তে (জানুয়ারী, 1981) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডিএসসি (সাম্মানিক) ডিগ্রি প্রদান করে। 1981 সালের 8ই এপ্রিল 86 বছর বয়সে গোপালচন্দ্রের জীবনাবসান হয়।

সম্প্রতি 'গাট-মাইক্রোবায়োম' (অন্ত্রের জীবাণু ও তাদের জৈব-অণু) নিয়ে গবেষণায় বিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয়, গোপালচন্দ্র সেই পঞ্চাশের দশকে 'গাট-মাইক্রোবায়োম' নিয়ে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। ব্যাঙাচি থেকে ব্যাঙের রূপান্তরে পেনিসিলিনের ভূমিকা সংক্রান্ত নিরীক্ষায়, শুধু-জলে রাখা ব্যাঙাচি আর পেনিসিলিনের-জলে রাখা ব্যাঙাচি উভয়ের শরীরেই অস্ত্রোপচার ক'রে তাদের দেহের ভেতরকার 'ফ্লোরা কালচার' করেন। দেখেন, শুধু-জলে রাখা ব্যাঙাচির অন্ত্রে

কম করে দু'জাতীয় কঙ্কাসের (জীবাণুর) অস্তিত্ব রয়েছে, যার কাজ ভিটামিন বি-12 তৈরি করা। পেনিসিলিনের জলে রাখা ব্যাঙাচির ক্ষেত্রে কোনও জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে প্রাণীদের স্বভাব, আচরণ ও নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ (ভাষা?) নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা-কাজ শুরু হয়েছে। ভাবতে অবাক লাগে, প্রাক স্বাধীনতা কালে (1921–1947) গোপালচন্দ্র তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ ও কৌতূহলী মনন নিয়ে প্রাণী-আচরণ/স্বভাব বিষয়ে কতই না উল্লেখযোগ্য গবেষণা-অবদান রেখে গেছেন!

বস্তুতঃ প্রাণীর আচরণ-স্বভাব পর্যবেক্ষণে লিপ্ত জীব-বিজ্ঞানের 'ইথোলোজি' শাখায় গোপালচন্দ্র একজন

পথিকৃৎ বিজ্ঞানী হিসাবে সমাদৃত হবার দাবীদার। কিন্তু বাস্তবে তাঁর যোগ্য সম্মান কি তিনি পেয়েছেন? তাঁর জীবদ্দশায় কিংবা এত বছর পরে আজও! বরং উল্টোটাই সত্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু ডিগ্রী না থাকায় জীবিত অবস্থায় পেয়েছেন উপেক্ষা ও অনাদর। আর অতীত-বিস্মৃত বাঙালী তাঁকে মনেই রাখেনি। এখনও তাঁর কাজের সঠিক মূল্যায়ন হয়নি, না বিজ্ঞানী হিসাবে, না বিজ্ঞান-সাহিত্যিক হিসাবে। তবে কি গোপালচন্দ্র চিরকাল উপেক্ষিতই থাকবেন? ◆

*লেখক **ডঃ সিদ্ধার্থ জোয়ারদার** পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞান লেখক ও প্রচারক। ইমেল: joardar69@gmail।com*

ছড়ায় ছয় ঋতু

সঞ্চালী রায়

গরমকালে সুয্যি মামা
ভীষণ রেগে থাকেন,
রোদের তাপে হাতটি নেড়ে
আমায় শুধু ডাকেন।

বর্ষাকালে মেঘের পিসি
গোমরা মুখে থাকেন,
বৃষ্টি দিয়ে প্রবল বেগে
আমায় ভালো রাখেন।

শরৎকালে কাশের বনে
বইছে মিষ্টি হাওয়া,
খুশি মনে তাইতো আমার
আগমনী গাওয়া।

হেমন্তে যেই ধানের ক্ষেত
সোনালি হয়ে যায়,
ভাতের ফ্যানে চুমুক দিয়ে
গাঁয়ের সবাই খায়।

শীতের সময় ঘাসের উপর
অনেক শিশির জমে,
হিমেল বাতাস বইতে থাকে
মাঘের সমাগমে।

বসন্তকাল এলেই কোকিল
গাইছে মধুর সুরে,
ছয়টি ঋতু বারেবারে
আসে বছর ঘুরে।

শ্রীমতি সঞ্চালী রায় বিশিষ্ট কবি, ছড়াকার এবং জীবন বিজ্ঞান শিক্ষিকা। ইমেল: sanchaliray2000@gmail.com

অ্যানিউরিজম পরবর্তী আংশিক ঢেকে যাওয়া বৃক্ক বা রেনাল ধমনীর প্রবাহগত ঘটনা

ধূর্জটি প্রাসাদ চক্রবর্তী

স্ফীত রক্ত নালীর মেরামতি; বা Endovascular Aneurysm Repair (EVAR) হল একটি আধুনিক, কম আক্রমণাত্মক অস্ত্রোপচার পদ্ধতি, যা পেটের মহাধমনীর স্ফীতি বা অ্যাবডোমিনাল অ্যার্টিক অ্যানিউরিজম (AAA); জাতীয় সমস্যা-চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। একটি অ্যানিউরিজম হল রক্তনালির এক অংশ যেখানে দেয়াল পাতলা ও দুর্বল হয়ে ফুলে ওঠে। এটি যেকোনো সময় ফেটে গিয়ে মারাত্মক অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে। EVAR-এর মাধ্যমে এই দুর্বল জায়গার ভেতরে একটি টিউব (স্টেন্ট গ্রাফট) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, যাতে রক্ত আর ফোলা জায়গা দিয়ে না বয়ে নিরাপদ পথে চলে। সাধারণত পা বা হাতের ধমনির মাধ্যমে এটি ছোট ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করানো হয়। খোলা সার্জারির তুলনায় কম কষ্ট ও দ্রুত আরোগ্যলাভ সম্ভব। রোগীকে সাধারণত কম সময় হাসপাতালে থাকতে হয়। বয়স্ক ও উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের জন্য নিরাপদ বিকল্প।

EVAR এর প্রধান সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে খোলামেলা সার্জারির তুলনায় কম সময়ে সুস্থ হওয়া এবং মৃত্যুর হার কমে যাওয়া। তবে এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে, যেমন মধ্যম পর্যায়ে রেনাল জটিলতার হার খোলামেলা সার্জারির সমান এবং বার বার হস্তক্ষেপের হার তুলনামূলক বেশি।

যদি ছবিতে প্রদর্শিত কভার্ড-স্টেন্টটি AAA-র উপর সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়, তবুও স্টেন্ট স্থাপনের পর রক্তপ্রবাহের চাপ বা অ্যার্টিক গতিশীলতার কারণে এটি সরে যেতে পারে এবং রেনাল অরিফিস আংশিকভাবে আবৃত হয়ে যেতে পারে। এর ফলে বৃক্কীয় (রেনাল) অকার্যকারিতা এবং আংশিক রেনাল কভারেজের মধ্যে একটা যুক্তিযুক্ত সম্পর্ক একটি যৌক্তিকতা করা যেতে পারে।

আজকাল বিজ্ঞানীরা কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিক্স (CFD) পদ্ধতি ব্যবহার করে আংশিক রেনাল কভারেজের জন্য হেমোডাইনামিক্সের উপর এর প্রভাব বিশ্লেষণ করে। তারা দেখতে পান যে রেনাল শাখা বরাবর আংশিক কভারেজের ফলে প্রবাহের মধ্যে পুনঃচক্রণ গতি বা ভর্টেক্স তৈরি হয়, যার ফলে দেওয়ালে শিয়ার স্ট্রেসের (Wall Shear Stress; WSS) বণ্টন প্রতিকূল হয়ে যায় (Time-average WSS; TAWSS)। ফলস্বরূপ, রেনাল ধমনিতে বাধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে Oscillatory Shear Index (OSI) এবং Relative Residence Time (RRT) এর মানও বেড়ে যায়।

আংশিক রেনাল কভারেজের ফলে রক্তপ্রবাহের পরিমান এবং ওয়াল শিয়ার স্ট্রেসের প্রভাবে ধমনীর নিকটবর্তী প্রাচীরে শিয়ার স্ট্রেস কম এবং অস্থায়ী হতে থাকে, যা ভবিষ্যতে স্টেনোসিস ও অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এসব গবেষণায় হেমোডাইনামিক প্যারামিটার নির্ধারণে দ্বিমাত্রিক (2D) বেগ পরিমাপ

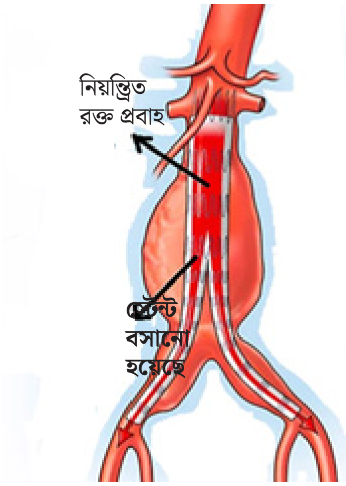

চিত্র ১ – পেটের ফোলা ধমনী (AAA) এবং স্টেন্ট

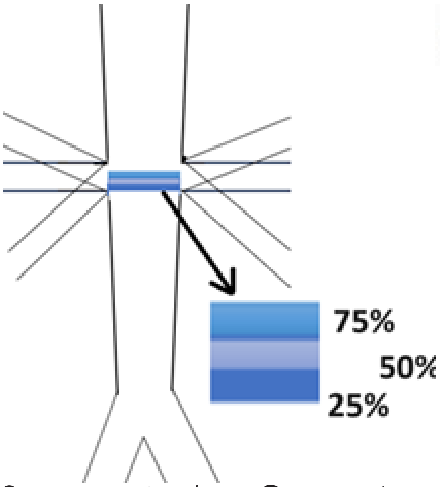

চিত্র ২ – আদর্শ পেটের ধমনী (AA) গঠন, যার ভিসারাল শাখা, তিনটি সাধারণ টেক-অফ কোণ, 110 ডিগ্রি (উর্ধ্বমুখী), 90 ডিগ্রি (অনুভূমিক), এবং 50 ডিগ্রি (নিচের দিকে)

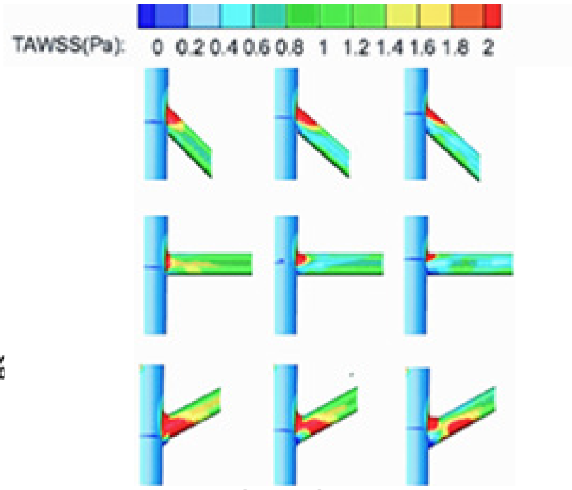

চিত্র ৩ – বাম বৃক্কীয় ধমনীতে অস্থির WSS ওঠানামা। তিন ধরণের বৃক্কীয় অভিযোজন (নিম্নমুখী, অনুভূমিক, উর্ধ্বমুখী) এবং তিন ধরণের আংশিক বৃক্কীয় কভারেজ (25%, 50%, 75%)।

পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও বাস্তবে রেনাল ধমনির রক্তপ্রবাহ ত্রিমাত্রিক (3D)।

রেনাল ধমনির আংশিক কভারেজ দেখা গেলে, সার্জনদের হস্তক্ষেপ না আরো পর্যবেক্ষণ; কোনটা বেশি জরুরি – এই সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

রেনাল ধমনির অভিমুখ হেমোডাইনামিক পরিবেশ এবং রক্ত-পরিপুষ্টির ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। যেমন, রোগীদের ক্ষেত্রে রেনাল অভিমুখের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা যায়, উপরদিকে অভিমুখী রেনাল ধমনিতে রেনাল আর্টারি লস-এর সম্ভাবনা বেশি, আর নিচদিকে অভিমুখ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে

যেহেতু কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডাইনামিক্স কার্ডিওভাসকুলার রোগের শারীরবৃত্তীয় কার্যপ্রণালী যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে সক্ষম, তাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন রেনাল অভিমুখের উপর ভিত্তি করে আংশিক কভারেজের হেমোডাইনামিক প্রভাব সংখ্যাগতভাবে বিশ্লেষণ করা। EVAR এর ক্ষেত্রে রেনাল আর্টারির গঠন অনুযায়ী সম্ভাব্য রেনাল রোগের ঝুঁকি বোঝার জন্যই এই ধরনের গবেষণা।

TAWSS বা RRT-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে, হালকা আংশিক কভারেজ (~25%) অবস্থায় নিচের দিকে অভিমুখী রেনাল ধমনীতে কম প্রতিকূল WSS বণ্টন পরিলক্ষিত হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য যে, উচ্চ RRT অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এবং এমনকি রেনাল ব্লকেজের সাথে সম্পর্কযুক্ত, এবং নিম্ন WSS এন্ডোথেলিয়াল কোষের মৃত্যুর, অবক্ষয়ের এবং ইন্ট্রালুমিনাল থ্রম্বাস সঞ্চয়ের কারণ হতে পারে।

অতএব, হালকা আংশিক কভারেজের ক্ষেত্রে নিচের দিকে অভিমুখী রেনাল ধমনীতে থ্রম্বোসিসের ঝুঁকি কম হতে পারে।

গবেষণাতে এও উঠে এসেছে, যেখানে বলা হয়েছে যে রেনাল আর্টারি ক্ষয় এবং ব্লকেজ রোধে রেনাল ধমনিকে নিচের দিকে অভিমুখে স্থাপন করা উচিত।

তবে, তিনটি অভিমুখেই প্রাচীর বরাবর প্রতিকূল WSS বণ্টন আংশিক কভারেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় (~50%)।

নিচের দিকে অভিমুখী রেনাল ধমনির ক্ষেত্রে, প্রাচীরে সবসময় উচ্চ OSI এবং RRT এর অঞ্চল বিদ্যমান থাকে; অন্যদিকে, বাকি দুই অভিমুখের ক্ষেত্রে উভয় প্রাচীরেই এর মান বেশি হয়।

উপরের দিকে অভিমুখ EVAR পরবর্তী ডায়াস্টলিক পর্যায়ে বিপরীত চাপ প্রবণতা হ্রাস করে এবং রেনাল ধমনিতে রক্তের ব্যাকফ্লোকে উৎসাহ দেয়।

উপসংহার হিসেবে বলা যেতে পারে যে—

১) EVAR-এর পরে হালকা রেনাল কভারেজ পরিস্থিতিতে, নিচের দিকে অভিমুখী রেনাল ধমনিগুলো রেনাল অবরোধের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হতে পারে।

২) যে কোনো অভিমুখেই, যদি কভারেজ গুরুতর (50%-এর বেশি) হয়, তাহলে রেনাল জটিলতার ঝুঁকি অত্যন্ত বেড়ে যায় কারণ তীব্রভাবে ব্যাহত প্রাচীর শিয়ার স্ট্রেস (WSS) বণ্টন দেখা যায়।

৩) অনুভূমিক অভিমুখী রেনাল ধমনিগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি অপ্রীতিকর WSS বণ্টনের শিকার হয়, এমনকি হালকা কভারেজের ক্ষেত্রেও। তাই এই ধরনের অভিমুখের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী ফলো-আপ পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হতে পারে। ◆

*লেখক **ডঃ ধূর্জটি প্রসাদ চক্রবর্তী** ওয়েস্ট ইন্ডিজ বিশ্ববিদ্যালয়, সেন্ট অগাস্টিন, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো-র পরিবহন সংক্রান্ত রাসায়নিক প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক। ইমেল: dhurjatiprasad@gmail।com*

সৌরজগতের সৃষ্টি কাহিনী

সিদ্ধার্থ রায়

মাঝখানে সূর্য এবং তাকে ঘিরে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিক্রমণরত আটটি গ্রহকে নিয়ে এই সৌরজগৎ। সূর্যের নিকটতম থেকে দূরের গ্রহগুলি হলো যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন। প্লুটোকে এখন আর নবম গ্রহ হিসাবে গণ্য করা হয় না, কারণ জ্যোতির্বিদরা এই সৌরজগতের মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন আরো কতগুলো গাগনিক বস্তু যেগুলির আয়তন প্লুটোর সমতুল্য। মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষপথের মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে একটি গ্রহাণু বলয় যেখানে অবস্থান করছে অসংখ্য ছোট-বড় অনিয়মিত আকৃতির গ্রহাণুর দল। নেপচুন গ্রহের কক্ষপথের বাইরের দিকে রয়েছে আরেকটি বিশাল অঞ্চল যেখানে বাসা বেঁধে রয়েছে অগুনতি বরফে মোড়া উল্কা, প্লুটো-সদৃশ আরো কয়েকটি বামন গ্রহ এবং অসংখ্য ছোট বস্তুপিন্ড, যার নাম কুইপার (Kuiper) বলয়। প্লুটো অবস্থিত এই বলয়ের মধ্যে। সৌরজগৎ কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অনেক বিজ্ঞানীরা মনে করেন কুইপার বলয়ের দূরত্বের থেকেও অনেক দূরে অবস্থান করছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু এবং কণা দিয়ে তৈরী আরেকটি গোলাকার আস্তরণ। ঊর্ট মেঘ নামক এই প্রকল্পিত গোলকটিও নাকি সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এবং এটিকেই সৌরজগতের সীমা ধরা হয়, যদিও পরীক্ষিতভাবে এই গোলকটির অস্তিত্ব এখনো প্রমান করা যায়নি।

এমত সৌরজগৎটির সৃষ্টি কিভাবে ঘটেছিলো, সেটি মানুষকে ভাবিয়েছে অনেককাল ধরে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা সৌরজগতের যে সকল বৈশিষ্টের কথা জানতে পেরেছেন, তার মধ্যে নীচের কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—

(১) সবগুলি গ্রহই প্রায় একই কক্ষতলে থেকে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে, এই তলটিকে সৌরতল বলে।

(২) সৌরতলের বাইরে গিয়ে ধ্রুবতারার দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে দুটি বলয় সহ গ্রহগুলি সূর্যকে পরিক্রমণ করছে বামাবর্তে।

(৩) একমাত্র শুক্রগ্রহ ছাড়া বাকি সব গ্রহগুলি, এমনকি সূর্যও তাদের নিজ নিজ অক্ষের ওপর আবর্তন করছে বামাবর্তে (যেমন পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে ঘুরছে)।

(৪) এমনকি, উপগ্রহগুলিও তাদের গ্রহগুলির চারিদিকে পরিক্রমণ করছে বামাবর্তে।

সৌরজগতের সব সদস্যের এইরূপ একদেশীয় গতি দেখে অনুমান করা স্বাভাবিক যে এরা সকলে একই সঙ্গে নির্দিষ্ট কোনো এক মহাজাগতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল।

বিজ্ঞানী নিউটনের সময় থেকেই সৌরজগৎ সৃষ্টির দুটি ভিন্ন মতবাদ চালু ছিল। তার মধ্যে একটি হল "দুর্ঘটনাজনিত প্রকল্প (catastrophic hypothesis)" এবং অন্যটি "বিবর্তনবাদী প্রকল্প (evolutionary hypothesis)"। দুর্ঘটনাজনিত প্রকল্প, যেটিকে সংঘর্ষ (collision) প্রকল্পও বলা হয়, সেটির বক্তব্য হল সৌরজগতের সৃষ্টির সময় নবীন সূর্য এবং ওপর একটি নিকটবর্তী তারকার মধ্যে সংঘর্ষ বা নিকট-সংঘর্ষের ফলে সূর্য থেকে কিছু পদার্থ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে গ্রহ-উপগ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে, বিবর্তনবাদীদের মতে একটি মহাজাগতিক পদার্থমেঘের চাকতি, অর্থাৎ নীহারিকার (nebula) ধীরে ধীরে সূর্য এবং গ্রহগুলির জন্ম হয়েছিল মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বলের প্রভাবে। নিউটনও এই জাতীয় এক বিবর্তনবাদী তত্ত্বকে বিশ্বাস করতেন।

সৌরজগৎ সৃষ্টির আধুনিক তত্ত্বটিতে পৌঁছনোর পথে অবশ্য অনেকগুলি দুরূহ সমস্যার সমাধান করতে হয়েছিল বিজ্ঞানীদের। তার মধ্যে প্রথম প্রশ্নটি হল, অতি দুর্বল মহাকর্ষীয় বলের প্রভাবে মহাশূন্যে দূরে দূরে ছড়ানো পারমাণবিক

বিগব্যাং বিস্ফোরণ

কণাগুলি একত্রিত হল কিভাবে? এই প্রশ্নটি দুটি মতবাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হল, এটি সম্ভব হয়েছিল আলোক বিকিরণের দ্বারা প্রযুক্ত চাপের ফলে। মহাকাশে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ পরমাণু আলোক বিকিরণের চাপ অনুভব করবে তার চারপাশ থেকে সমানভাবে। যদি দুটি পরমাণু আকস্মিকভাবে খুব কাছে এসে পড়ে, তখন দুটি পরমাণুর পরস্পর ছুঁয়ে যাওয়া দিক থেকে বিকিরণের চাপ কমে যায়, তখন কণাদুটির মধ্যে আকর্ষণ বল সক্রিয় হয়ে কোনাদুটি যুক্ত হয়ে যায়। এইভাবে যুক্ত কণাদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তার মহাকর্ষীয় আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পেতে থেকে এবং নিকটবর্তী পদার্থ কণারা তার প্রতি আকর্ষিত হয়ে তার আয়তন বৃদ্ধি করতে থাকে। এইভাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল সূর্য নামক নক্ষত্রটি।

বিজ্ঞানীদের মতে বিগব্যাং বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিশ্ব সৃষ্টির পড়ে প্রথমে কেবল হাইড্রোজেন পরমাণু এবং তার এক নির্দিষ্ট অনুপাতে হিলিয়াম পরমাণু সৃষ্টি হয়েছিল। অধিকতর ভারী মৌলগুলি নক্ষত্রদের অন্দরে পারমাণবিক সংযোজন (nuclear fusion) নামক একটি পদ্ধতির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল (আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এই পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো না)। যেহেতু সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহগুলির মধ্যে ভারী মৌল পদার্থগুলি বর্তমান, এটা ধরে নেওয়া হয়েছে, যে প্রাথমিক নীহারিকা থেকে সৌরজগতের জন্ম হয়েছিল সেটির উদ্ভব হয়েছিল কোনো একটি পূর্ববর্তী নক্ষত্রের বিস্ফোরণের অবশিষ্ট্যাংশ থেকে, যে নক্ষত্রটির মধ্যে ভারী মৌলগুলি তৈরী হয়েছিল।

এরূপ পদার্থকণার মেঘ থেকে এইভাবে একটি বিশাল ভরযুক্ত সূর্যের যদি সৃষ্টি হয়েও থাকে, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে তবে অন্যান্য ক্ষুদ্রতর গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম কিভাবে হল?

1796 খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ তথা জ্যোতির্বিদ পিয়ের সাইমন দ্য লাপ্লাস এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির একটি বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে মহাজাগতিক মেঘটি যখন মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে ধীরে ধীরে আয়তনে সংকুচিত হচ্ছিলো, তখন সমগ্র মেঘটির মধ্যে একটি ঘূরণগতি (eddy) সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যখন বহু সংখ্যক পদার্থকণার আয়তন কোমর ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ঘটে, তখন সমগ্র পদার্থকণার মধ্যে একটা ঘূরণগতি অর্থাৎ ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। (এটা বাড়িতেও একটা সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমান করা যা। বাড়ির মুখ ধোয়ার বেসিনে, সেটা গোলাকার হলে আরো ভালো হয়, তোলার ফুটো বন্ধ করে বেসিনটা জল দিয়ে ভর্তি করা যাক। কিছু সময় রেখে জলের মধ্যে যাবতীয় গতি বন্ধ হলে, যদি তোলার ফুটো খুলে দেওয়া হয়, দেখা যাবে বেসিনের পুরো জল কেন্দ্রের ফুটোর দিকে আকর্ষিত হয়ে চলা শুরু করেছে। তখন আরো দেখা যাবে যে বেসিনের জলে একটা ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছে।)

মহাজাগতিক সংকোচনশীল মেঘের মধ্যেও এরূপ ঘূর্ণি সৃষ্টি হয়েছিল। কৌণিক ভরগতির নিত্যতা সূত্র অনুসারে মেঘটি আয়তনে যত সংকুচিত হয়েছিল, তার ঘূর্ণন গতিও তত বৃদ্ধি পেয়েছিলো। লাপ্লাস প্রস্তাব করলেন, যখন পুরো মেঘটি অত্যাধিক বেগে ঘুরতে শুরু করে তখন তার বাইরের দিকের একটি বলয়াকার অংশ মূল মেঘের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে সাময়িকভাবে বাকি মূল মেঘের ঘূর্ণনগতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিলো। সেই মেঘটি পরে আরো সংকুচিত হবার কারণে তার ঘূর্ণন গতি পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে, ফলস্বরূপ দ্বিতীয় একটি বলয় বিচ্ছিন্ন হয়। এইভাবে অনেকগুলি পদার্থ বলয় বিচ্ছিন্ন হবার পরে কেন্দ্রের দিকের পদার্থ একত্রিত হয়ে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছিল। স্বতন্ত্র বলয়গুলির পদার্থ একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল গ্রহগুলি। একইভাবে গ্রহগুলির মেঘ সংকুচিত হবার সময় সৃষ্টি হয় উপগ্রহগুলি।

এইভাবে সূর্য এবং গ্রহ সৃষ্টির প্রকল্পটি নীহারিকা প্রকল্প নাম পরিচিত হয়। প্রকল্পটি সৌরজগতের মূল বৈশিষ্টগুলির সঙ্গে, এমনকি কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্টের সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। গ্রহাণু বলয়টি সম্ভবত এইরকম কোনো বিচ্ছিন্ন হাওয়া পদার্থ বলয় থেকে সৃষ্টি হয়েছে যার ক্ষুদ্রতর খণ্ডগুলি কোনো কারণে যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ গ্রহতে পরিণত হতে পারে নি। শনিগ্রহের বলয়গুলির জন্যও একই কথা বলা চলে।

লাপ্লাস প্রস্তাবিত নীহারিকা প্রকল্পটি বহু বছর ধরে গ্রহণযোগ্য থাকার পর ধীরে ধীরে এর জনপ্রিয়তায় ভাঁটা পড়তে থাকে উনবংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। এর অন্যতম কারণ ছিল বিখ্যাত স্কটল্যান্ডবাসী বিজ্ঞানী জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের একটি তাত্ত্বিক গবেষণা। 1859 সালে উনি

মহাজাগতিক মেঘ (সূত্র: ইন্টারনেট)

সৌরজগতের উৎপত্তি (*সূত্র: ইন্টারনেট*)

অঙ্ক কোষে প্রমান করেছিলেন যে পদার্থ কণার বলয়ের থেকে ছোট ছোট পদার্থকণাদের সৃষ্টি হলেও সেই খণ্ডগুলি একত্রে জোড়া লেগে গ্রহ বা উপগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই প্রকল্প গ্রহাণু বলয় বা শনির বলয় পর্যন্ত ব্যাখ্যা করতে পারলেও সূর্য বা অন্য গ্রহের সৃষ্টির কারণ ব্যখ্যা করতে অপারগ। নীহারিকা প্রকল্পটি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ব্যাখ্যা করতে অসমর্থ হলো। সবগুলি গ্রহের মিলিত ভর মোট সৌরভরের 0.13 শতাংশের সামান্য বেশি, কিন্তু এই গ্রহগুলির মিলিত ভরবেগ সৌর জগতের মোট ভরবেগের 98 শতাংশ! বিচ্ছিন্ন হয়ে jaowa বলয়গুলির মধ্যে এত কম ভর থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে আদি ঘূর্ণায়মান মেঘের কৌণিক ভরের এতো বেশি অংশ থাকে কিভাবে?

এইভাবে যখন সৌরজগতের সৃষ্টির বিবর্তনবাদী তত্ত্ব কোনঠাসা হয়ে পড়েছে, দুর্ঘটনাভিত্তিক প্রকল্পগুলি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। টমাস চেম্বারলেন এবং ফরেস্ট মূলটন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী একটি সংঘর্ষ প্রকল্পের অবতারণা করলেন। তাদের মতে একটি তারার সঙ্গে সূর্যের সংঘর্ষ ঘটেছিলো। এর ফলে গ্যাসীয় সূর্যের দেহ থেকে কিছু অংশ উৎক্ষিপ্ত ভেঙে সূর্যের অভিকর্ষ বলে মহাকাশের বিভিন্ন দূরত্বে গিয়ে আটকে পরে। কাছাকাছি থাকা অনুগ্রহগুলি ক্রমে একত্রিত হয়ে গ্রহগুলি এবং তাদের উপগ্রহগুলির সৃষ্টি করেছিল। এই প্রকল্পটি গ্রহাণু (planetesimal) প্রকল্প নাম পরিচিত। গ্রহগুলির মধ্যে অতিরিক্ত কৌণিক ভর এল কোথা থেকে, সেই প্রশ্নের উত্তর দিলেন জন হপউড নামের এক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী 1918 সালে। তিনি বললেন, যে নক্ষত্রটি সূর্যের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল সেটি সূর্যের ধার ঘেঁষে যাবার সময় সূর্যের থেকে পদার্থ চেঁছে নিয়েছিল, সেটিই সেই বিচ্ছিন্ন পদার্থ পিণ্ডদের মধ্যে যথেষ্ট কৌণিক ভর সঞ্চার করেছিল। গ্রহাণু প্রকল্প অবশ্য সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্র কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিল সে ব্যাপারে কোনো হদিস দেয় না।

অন্যান্য বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদদের দ্বারা প্রচারিত আরো কয়েকটি প্রকল্প আছে যেগুলিকে দুর্ঘটনাভিত্তিক বলে আখ্যায়িত করা চলে। সেগুলি হলো:

(ক) 1964 সালে মাইকেল উল্ফসন প্রস্তাব করেছিলেন যে গ্রহদের সৃষ্টি হয়েছিল সূর্যের আকর্ষণে একটি অতি কম ঘনত্বের জায়মান তারার থেকে পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয়ে। এর ফলে তারাটি বিলুপ্ত হয় এবং উৎক্ষিপ্ত পদার্থকণার দলাগুলি সূর্যের থেকে বিভিন্ন দূরত্বে জমাট বেঁধে গ্রহ ও উপগ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছিল।

(খ) বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রেড হয়েল একসময় প্রস্তাব করেছিলেন যে একটি নক্ষত্রের সুপারনোভা (নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ) ঘটে ফলে একটি বড় পদার্থকণার মেঘ ক্রমে সংকুচিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এই সৌরজগতের।

দুর্ঘটনাভিত্তিক প্রকল্পগুলিরও সমালোচনা হয়েছিল। জ্যোতির্বিদরা ইতিমধ্যেই পর্যবেক্ষণ করেছিলেন মহাকাশে নক্ষত্রগুলি এত দূরে দূরে অবস্থান করছে যে নবীন সূর্যের সঙ্গে

আকাশগঙ্গা। *প্যাংগং লেকের পার থেকে শ্রী হিমাদ্রি শিখর লাহিড়ীর গৃহীত আলোকচিত্র।*

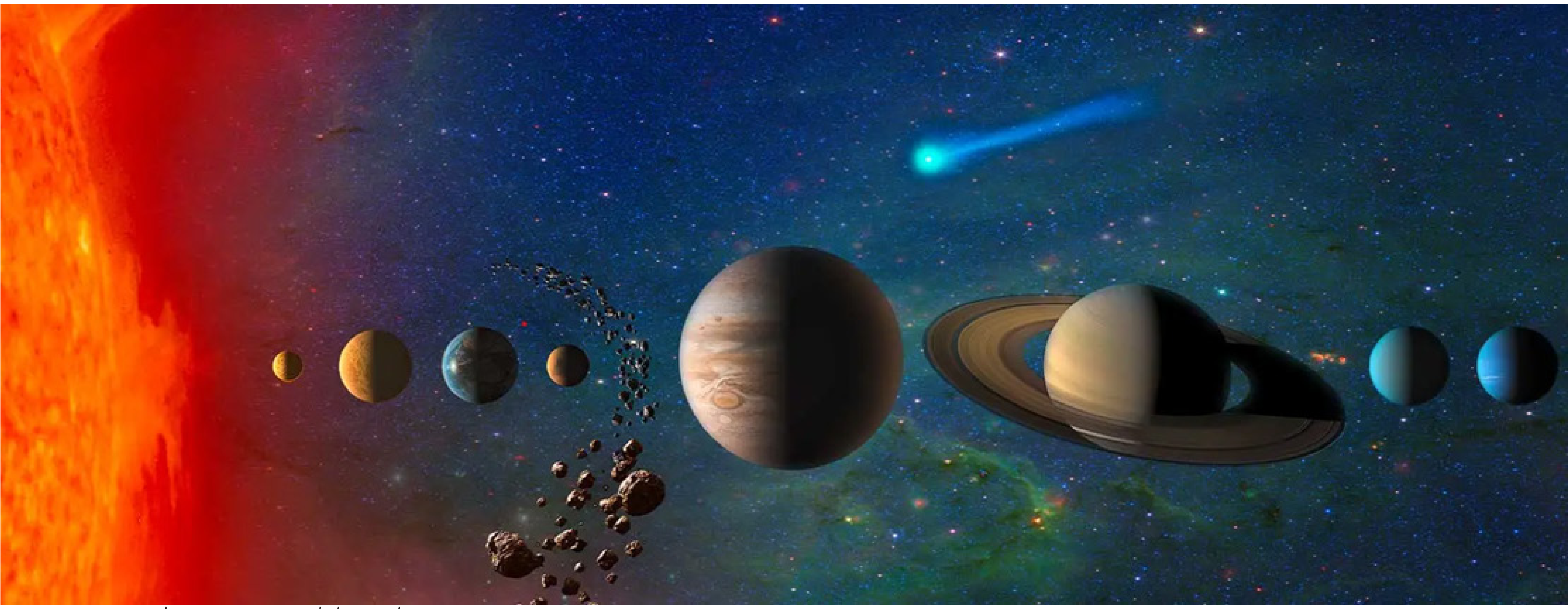

সৌরজগৎ (*সূত্র: ইন্টারনেট*)

ওপর একটি নক্ষত্রের সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। এই জাতীয় একটি সংঘর্ষ যদি অতীতে ঘটেও থাকে, গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যে তার মাধ্যমে গ্রহদের সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি। বিজ্ঞানী হেনরি রাসেল অঙ্ক কোষে দেখালেন যে সেরকম এক সংঘর্ষে উৎক্ষিপ্ত পদার্থগুলি বর্তমান গ্রহদের দূরত্বের কমপক্ষে হাজার গুণ বেশি দূরত্বে চলে যেত। 1936 সালে মার্কিন জ্যোতির্বিদ লাইম্যান স্পিৎজার প্রমান করেছিলেন যে উত্তপ্ত গ্যাসীয় পদার্থকণারা একত্রিত হয়ে জমাট না বেঁধে বরং মহাকাশে বাষ্পাকারে ছড়িয়ে পড়তো।

এইসব সমালোচনার মুখে দুর্ঘটনাভিত্তিক প্রকল্পগুলি যখন মৃত্যুমুখে, তখন বিজ্ঞানীরা পুনরায় নীহারিকা প্রকল্পের দিকে নতুন করে নজর দিলেন। ইতিমধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জ (Galaxy) এবং প্রতিটি নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থান করছে অগুনতি স্বতন্ত্র নক্ষত্র এবং তাদের গ্রহরা।

উপরোক্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে 1938 সালে জার্মান পদার্থবিদ কার্ল ফ্রেডেরিখ ফন ওয়াইজ্যাখার সৌরজগৎ তথা যাবতীয় নক্ষত্র গঠনের একটি তত্ত্ব প্রকাশ করলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রাক্কালে পদার্থকণার মেঘে সৃষ্টি হয়েছিল বহুসংখ্যক ঘূর্ণি। এরূপ প্রতিটি ঘূর্ণি জন্ম দিয়েছিলো এক একটি স্বতন্ত্র নক্ষত্রপুঞ্জের। যখন এই জাতীয় বিশাল ঘূর্ণায়মান মেঘগুলি সংকুচিত হচ্ছিলো, তার মধ্যে তৈরী হয়েছিল অগুনতি ক্ষুদ্রাকার ঘূর্ণির, যেগুলি সৃষ্টি করেছিল স্বতন্ত্র নক্ষত্র এবং নক্ষত্রমণ্ডলের। এইসব নক্ষত্র সৃষ্টিকারী ঘূর্ণির প্রান্তদেশে তৈরী হওয়া ক্ষুদ্রতম ঘূর্ণির থেকে সৃষ্টি হয়েছিল গ্রহাণুদের, যেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলে সৃষ্টি করেছিল গ্রহ এবং উপগ্রহদের।

ওয়াইজ্যাখারের তত্ত্বটি আরো কয়েকটি পরীক্ষামূলকভাবে আবিষ্কৃত তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করলো। তার মধ্যে একটি হলো সূর্য থেকে শুরু করে বাইরের দিকের গ্রহগুলির কক্ষপথের ব্যাস ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া। এটির কারণ সূর্যের থেকে দূরের গ্রহ সৃষ্টিকারী ঘূর্ণিগুলির আয়তন ক্রমান্বয়ে বড় হওয়া। আরেকটি সত্য ওয়াইজ্যাখারের তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে, সেটা হলো সূর্যের মতো অন্যান্য নক্ষত্রের গ্রহ থাকার সম্ভাবনা। রাশিয়ান মার্কিন পদার্থবিদ জর্জ গ্যামো এই তত্ত্বটিকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলেন।

সৌরজগৎ সৃষ্টির এই তত্ত্বটি সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য হলেও এটি কিন্তু সৌর গ্রহগুলিতে তুলনামূলকভাবে অত্যাধিক কৌণিক ভরবেগ কেন বর্তমান সেটি ব্যাখ্যা করতে পারে না। এই ঘটনাটি ব্যাখ্যা করলেন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সুইডেনবাসী ইঞ্জিনিয়ার হান্স আল্ফডেন। তিনি বললেন, সৌরজগতের সৃষ্টির সময় সূর্যের ভরবেগ ছিল, যেমনটি থাকার কথা তেমনই, সবথেকে বেশি। সূর্যের আবর্তনের হার ছিল বর্তমানের তুলনায় অনেক অনেক বেশি। কিন্তু সূর্যের অন্দরের চৌম্বক ক্ষেত্রটি ব্রেকের মতো কাজ করেছে। এর ফলে ক্রমে সূর্যের আবর্তনের হার ধীরে ধীরে কমেছে, এবং এর বিশাল কৌণিক ভরবেগ স্থানান্তরিত হয়েছে গ্রহগুলিতে। বর্তমানে ওয়াইজ্যাখারের তত্ত্বটি চৌম্বক এবং মহাকর্ষ বলগুলির প্রয়োগে পরিমার্জিত হয়ে সৌরজগতের সৃষ্টির একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা বলে স্বীকৃত।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে আমাদের সৌরজগতের মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি বর্তমান, যেমন কয়েকটি গ্রহের আবর্তন অক্ষগুলি তাদের কক্ষতলের সঙ্গে বিভিন্ন কোনে অবস্থিত, অথবা শুক্রগ্রহের আবর্তন দক্ষিণাবর্ত, ইত্যাদি; সেগুলিকে কিন্তু এই তত্ত্বের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই অসঙ্গতিগুলির প্রত্যেকটির জন্য আছে আলাদা তত্ত্ব বা প্রকল্প, যেগুলি আমাদের এই আলোচনার পরিধির মধ্যে পরে না। সেগুলি আলোচনা করা যাবে অন্য কোনো এক প্রবন্ধে। ◆

*লেখক **ডঃ সিদ্ধার্থ রায়** এন.আই.টি.টি.টি.আর, কোলকাতার প্রাক্তন অধ্যাপক ও নির্দেশক এবং লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক।*
ইমেল: raysiddhartha@yahoo.com

105তম জন্মবার্ষিকীতে কল্পবিজ্ঞান কিংবদন্তি রে ব্র্যাডবেরি

সৌভিক চক্রবর্তী

গত শতাব্দীর চারের দশকের একেবারে গোড়ার দিক; একা হাতে সায়েন্স ফিকশন-এর সংজ্ঞা বদলে দেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন জন উড ক্যাম্পবেল। 1938 সালে সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই ঢেলে সাজিয়েছেন ‘অ্যাস্টাউন্ডিং সায়েন্স ফিকশন’ পত্রিকাকে, অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন পত্রিকার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ, দুর্ধর্ষ এক লেখকমণ্ডলী। জ্যাক উইলিয়ামসন, এল স্প্রেগ ডেক্যাম্প, ক্লিফোর্ড সিম্যাক, হেনরি কাটনার, ক্যাথারিন মুর, আইজ্যাক আসিমভ, রবার্ট হাইনলাইন, এ ই ভ্যান ভট—কে না ছিলেন তাতে! তিনের দশকে কল্পবিজ্ঞান থেকে প্রায় বিলুপ্তই হয়ে গিয়েছিল বিজ্ঞান, পড়ে ছিল অতিনাটকীয়তা, আজগুবি কিছু আবিষ্কার এবং সস্তা অ্যাডভেঞ্চার। হারানো বিজ্ঞানকে ‘অ্যাস্টাউন্ডিং’এর পাতায় সসম্মানে ফিরিয়েই এনেই ক্ষান্ত থাকলেন না এমআইটি-ফেরত ক্যাম্পবেল, যুক্তিবোধ ও বাস্তবতার শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে হার্ড সায়েন্স ফিকশনের ভবিষ্যৎ রূপরেখা আঁকার মশালও তুলে দিলেন তাঁর অনুগামী লেখকদের হাতে। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল, এমন সময়ে মূর্তিমান অনিয়মের মতো পেশাদারী লেখালিখির বৃত্তে পা রাখলেন রে ব্র্যাডবেরি। 1941-এর নভেম্বরে দ্বিতীয় শ্রেণির কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা ‘সুপার সায়েন্স স্টোরিজ’-এ প্রকাশ পেল তাঁর প্রথম ছোটগল্প ‘পেন্ডুলাম’। তবে ক্যাম্পবেল-এর বেঁধে দেওয়া নিয়ম অনুযায়ী কল্পবিজ্ঞান লেখার চেষ্টা ব্র্যাডবেরি করলেন না, কারণ বিজ্ঞানের চেয়েও তাঁর আগ্রহ বেশি ছিল মানবতার প্রতি। তাঁর লেখায় স্থান পেতে শুরু করল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, প্রযুক্তির সঙ্গে মানবিকতার বিরোধের প্রসঙ্গ, গাঢ় নস্টালজিয়া। ক্যাম্পবেল-এর কাছে কোনওদিনই এসবের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না; সায়েন্স ফিকশনে আবেগের অনুপ্রবেশ ছিল তাঁর দু’চোখের বিষ। ফলে যা হওয়ার তাই হল—‘অ্যাস্টাউন্ডিং’ থেকে ব্র্যাডবেরি প্রত্যাখ্যাত হলেন।

অসাফল্যের মুখে ব্র্যাডবেরি কিন্তু দমলেন না, বরং গভীর অধ্যাবসায়ে লিখে যেতে লাগলেন। 1950 সালে ডাবলডে প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হল তাঁর ‘দ্য মার্শিয়ান ক্রনিকলস’। রে ব্র্যাডবেরি ততদিনে আমেরিকান কল্পবিজ্ঞানের আঙিনায় মোটামুটি পরিচিত এক নাম। তবু প্রকাশকদের আশঙ্কার জায়গা ছিল, কারণ বইটা যে অদ্ভুত। উপন্যাস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও আদতে ধারাবাহিকতার সরু সুতোয় গাঁথা, উপক্রমণিকা দিয়ে জোড়া অনেকগুলো গল্পের সমষ্টি। বিষয়—মানুষের মঙ্গলগ্রহ অভিযান। মাস গেল, বছর গেল; বইবাজারে ‘মার্শিয়ান ক্রনিকলস’ কেবল ভেসেই রইল না, পাঠকের মুগ্ধতার ঢেউয়ে চেপে পৌঁছে গেল খ্যাতির চুড়োয়। মানুষের বিস্ময়বোধ, অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার আকাঙ্ক্ষা, মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার রোম্যান্স এবং ফেলে আসা অতীতের প্রতি তীব্র আকর্ষণকে তাঁর কাহিনিতে চমৎকারভাবে ব্যবহার করলেন ব্র্যাডবেরি, সঙ্গে কেকের ওপর চেরি হয়ে সামনে এল তাঁর অপূর্ব কাব্যময় ভাষা। ইতিহাস সৃষ্টি করল ‘দ্য মার্শিয়ান ক্রনিকলস’, কল্পবিজ্ঞানের ছোট্ট বৃত্তের বাইরে যে বৃহত্তর পাঠকসমাজ রয়েছে তার কাছেও নিজেকে জনপ্রিয় করে তুলল। ক্রিস্টোফার ঈশারউড-এর মতো মূলধারার সাহিত্যসমালোচকও উচ্ছ্বাস প্রকাশ না

রে ব্র্যাডবেরি (22 অগাস্ট , 1920–5 জুন, 2012)

করে পারলেন না— “...the sheer lift and power of a truly original imagination exhilarates...His is a very great and unusual talent.”

ব্র্যাডবেরি শুধুমাত্র লেখক ছিলেন না, ছিলেন এক ঋষিপ্রাজ্ঞ দার্শনিকও। ঋষির দৃষ্টিতে বারবার তিনি তাকিয়েছেন সমাজের দিকে, আমাদের জীবনে উপেক্ষিত অথচ প্রাসঙ্গিক সবকিছুকে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন সাহিত্যের মাধ্যমে। এজন্যই হয়তো শুকনো, কঠিন সায়েন্স ফিকশনের বদলে ‘মার্শিয়ান ক্রনিকলস্’ হয়ে উঠতে পেরেছিল মানবিক আবেদন এবং করুণরসে সম্পৃক্ত এক সার্থক কল্পবিজ্ঞান আখ্যান। তাঁর মঙ্গলগ্রহ কখনওই 1950 সালের কোনও জ্যোতির্বিজ্ঞানীর টেলিস্কোপে দেখা বৈজ্ঞানিক তথ্যনিষ্ঠ লালগ্রহ নয়, 1920 সালের স্মৃতিমেদুর আমেরিকার কোনও শহিরতলির নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। তাঁর গল্পের চরিত্রেরা প্রায় সবাই দৈনন্দিনের রঙ্গমঞ্চে পথ খুঁজে বেড়ানো পথিক, তাঁর রকেটগুলো স্বপ্নে দেখা পক্ষীরাজ, তাঁর বিজ্ঞানপ্রযুক্তি মানবসমাজকে সামগ্রিক পরিবর্তনের মুখে ঠেলে দিতে বদ্ধপরিকর এক অমোঘ শক্তি। ব্র্যাডবেরি-র মঙ্গলবাসীরাও পুরনো দিনের কল্পবিজ্ঞান গল্পের ‘বাগ আইড মনস্টার’-দের থেকে একেবারেই আলাদা। তারা প্রাচীন, বুদ্ধিমান, সুসভ্য; তারা সম্মোহন জানে, টেলিপ্যাথির সাহায্যে একে অপরের মনের কথা বুঝতে পারে; তাদের শিল্প-স্থাপত্য এক প্রাচীন উত্তরাধিকারের স্বাক্ষর বহন করে। অভিযান, অধিগ্রহণ ও অভিযোজনের আড়ালে ‘দ্য মার্শিয়ান ক্রনিকলস্’ এক বিস্তৃত রূপক, তথাকথিত ‘উন্নত’ দেশের মানুষদের লোভ ও স্বার্থপরতার কারণে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আদিবাসী সভ্যতার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, উপনিবেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্র্যাডবেরি-র নৈতিক প্রতিবাদ। এই উপন্যাসের প্রত্যেকটা গল্প একেকটা বার্তা বহন করে—‘মার্স ইজ হেভেন’এ আমরা খুঁজে পাই অতীতের সোনাঝরা দিনগুলোতে ফিরে যাওয়ার তীব্র আকুতি, ‘—দ্য মুন বি স্টিল অ্যাজ ব্রাইট’ গল্পের পাতায় পাতায় কবিতা হয়ে ঝরে পড়ে মঙ্গলের প্রাচীনতা, ইতিহাস ও নিজস্ব সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের অবহেলায় ব্যাথিত লেখকের আক্ষেপ, ‘দেয়ার উইল কাম সফ্ট রেইনস’ গল্পে পারমাণবিক অস্ত্রনির্ভর আধুনিক সভ্যতার প্রতি উচ্চারিত সতর্কবাণীর মধ্যে কোথাও যেন মিশে থাকে অনেকখানি মনখারাপ, প্যাথোস-এর রেশ।

1920-র 22 আগস্ট ইলিনয় স্টেটের ওয়াকিগেন শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন রে ডগলাস ব্র্যাডবেরি। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ছিলেন তিনি, গল্পের বইয়ের পাতায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন প্রায়ই। এডগার অ্যালান পো, জুলস ভের্ন, এইচ জি ওয়েলস, এল ফ্র্যাঙ্ক বাউম, এডগার রাইজ বারোজ প্রমুখ ছিলেন তাঁর অত্যন্ত পছন্দের লেখক। সার্কাস, কার্নিভাল আর ম্যাজিকের প্রতিও ছিল ব্র্যাডবেরি-র দুর্নিবার আকর্ষণ। 1932 সালের মে মাসে ‘দ্য ডিল ব্রাদার্স কম্বাইন্ড শোজ’ নামক কার্নিভালের তাবুতে কিশোর ব্র্যাডবেরি-র সুযোগ হয় ম্যাজিশিয়ান মিঃ ইলেকট্রিকো-র সঙ্গে আলাপ করার। বাস্তবের বাইরে অবস্থিত রহস্যময় জগতের সাথে সেটাই ছিল তাঁর প্রথম পরিচয়। বারো বছর বয়সি ব্র্যাডবেরি-র হৃদয়ে লেখক হওয়ার যে তীব্র ইচ্ছে পরবর্তীতে ডানা মেলেছিল তার পেছনে মিঃ ইলেকট্রিকো-র পরোক্ষ অবদান অনস্বীকার্য। সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে অমরত্বলাভের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর জীবনে আরেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল পাঠাগার। 1938 সালে হাইস্কুল পাশ করার পর প্রথাগত

শিক্ষাগ্রহণের আর কোনও সুযোগ পাননি ব্র্যাডবেরি। সেই দুঃসময়ে ওয়াকিগেন পাব্লিক লাইব্রেরি-ই হয়ে ওঠে তাঁর পরম বন্ধু। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানেই কাটাতেন তিনি, পড়তেন জঁর ফিকশন, মূলধারার সাহিত্য, আধুনিক কবিতা। লাইব্রেরি-তে বসেই প্রথমবারের জন্য ব্র্যাডবেরি সমসাময়িক কল্পবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসেন। প্রথম যৌবনে রোপিত হওয়া এই বীজ শুধুমাত্র তাঁর মননই গড়ে তোলেনি, আগামীর মহীরুহে পরিণত হওয়ার রসদও তাঁকে জুগিয়েছিল।

'গোল্ডেন অ্যাপেলস অফ দ্য সান' রে ব্র্যাডবেরি-র অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা, যেখানে 'কোপা ডে অরো' নামের এক মহাকাশযানে চড়ে একদল অভিযাত্রী মহাশূন্যে পাড়ি দেয়, সূর্যের বুক থেকে আগুন আনতে। প্রায় মহাকাব্যিক ভাষায় এখানে সূর্যের বন্দনা করেছেন ব্র্যাডবেরি, প্রকৃতির নিঃস্পৃহ অথচ ছন্দোবদ্ধ সৌন্দর্যকে অর্ঘ্য অর্পণ করেছেন—"For now there was only the sun and the sun and the sun. It was every horizon, it was every direction...It burned the eyelids and the serum of the dark world behind the lids, the retina, the hidden brain; and it burned sleep and the sweet memories of sleep and cool nightfall." পৌরাণিক ইকারাস নকল ডানায় ভর করে সূর্যের উচ্চতাকে ছুঁতে চেয়েছিলেন; অসীম সামর্থ্যবান টাইটান প্রমিথিউস পৃথিবীর মানুষের হিতার্থে স্বর্গ থেকে চুরি করে এনেছিলেন পবিত্র আগুন। ব্র্যাডবেরি-র গল্পের নায়ক,'কোপা ডে অরো'র ক্যাপ্টেন যেন তাঁদেরই যোগ্য উত্তরসূরী, মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা, প্রকৃতিকে জয় করার অদম্য ইচ্ছের মূর্ত প্রতীক।

'দ্য ম্যান' গল্পে আরেক মহাকাশচারী ক্যাপ্টেনকে পাই আমরা, কিন্তু তিনি কোনওভাবেই নায়ক নন, বরং নিয়তির কাছে হেরে যাওয়া একজন ক্ষুদ্র মানুষ। ঔদ্ধত্য এবং পেশিশক্তির আস্ফালনকে হাতিয়ার করে মানবতার মসীহার খোঁজ করেন তিনি, একের পর এক গ্রহে ছুটে বেড়ান, অথচ প্রতিবারই একতিলের জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। খালি চোখে সাদামাটা হলেও এই গল্পের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার এক গহিন সত্য—ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বিরাজমান, এবং তাঁকে বাইরে খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন। এই সত্য ক্যাপ্টেনের অজানা, সেজন্যই তিনি বারবার ব্যর্থ হন, এবং আগামীদিনেও হবেন, এমনটাই লেখকের মত—"And he'll go on, planet after planet, seeking and seeking, and always and always he will be an hour late, or a half hour late, or ten minutes late, or a minute late. And finally he will miss out by only a few seconds."

ব্র্যাডবেরি-র 'ক্যালাইডস্কোপ' কাহিনিতেও আধ্যাত্মিকতার ছাপ স্পষ্ট। মহাশূন্যের বুকে এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া অভিযাত্রীরা নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ধেয়ে যায়, পূর্বস্মৃতি রোমন্থন করতে করতে। প্রথমে আসে আতঙ্ক, তারপর ক্ষোভ, একেবারে শেষে অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নেওয়ার পালা—"They were all alone. Their voices had died like the echoes of the words of God spoken and vibrating in the

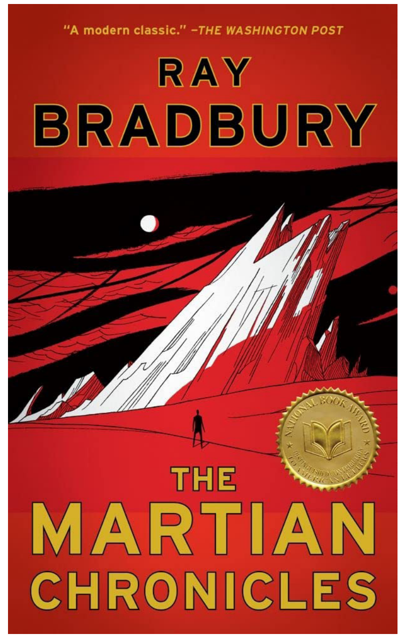

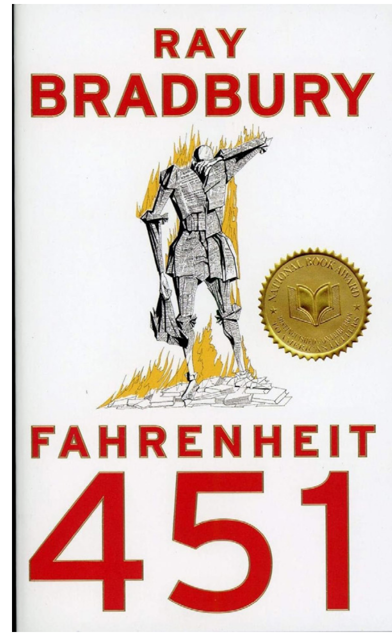

starred deep...the shards of the kaleidoscope that had formed a thinking pattern for so long, hurled apart." কাহিনির নায়ক লেস্পিয়ের উল্কার মতো খসে পড়ে পৃথিবীর বুকে, জ্বলে ওঠার আগের মুহূর্তে জীবনের অসাড়তা সম্পর্কে তার মনে প্রশ্ন জাগে। গল্প শেষ হয় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েই। পাঠক কিছুটা হলেও যেন উপলব্ধি করতে পারে ঈশ্বরের পরিকল্পনা; জন্ম বা মৃত্যু কখনও নিষ্ফল হয় না, মহাবিশ্বের প্রতিটা প্রাণীই কোনও না কোনও বৃহৎ উদ্দেশ্য পালন করে—এই আশাব্যঞ্জক ধারণা তার মনে দৃঢ়তর হয়।

আর যে গল্পের কথা না বললেই নয় তা হল 'অল সামার ইন আ ডে'। সুদূর শুক্রগ্রহে বসতি স্থাপন করেছে মানুষ। কিন্তু সেখানে শুধুই বৃষ্টি হয়, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। প্রতি সাত বছরে একবার সূর্য মুখ দেখায়, সেও মাত্র এক ঘণ্টার জন্য। সেকারণেই শুক্রগ্রহের অধিকাংশ শিশু কোনদিন সূর্য দেখেনি, যারা দেখেছে তারাও সোনা রঙের সেই আলোকপিণ্ডের স্মৃতি কবেই ভুলে গেছে। রাতের স্বপ্নে সূর্যের রূপ কল্পনা করে তারা, ছুঁতে চায় উষ্ণতা—"...they were dreaming and remembering gold or a yellow crayon or a coin large enough to buy the world with...a warmness, like a blushing in the face, in the body, in the arms and legs and trembling hands." শুধু একজন বাদে। জীবনের প্রথম চার বছর পৃথিবীর বুকে কাটিয়ে আসা; শান্ত, চুপচাপ, নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে ভালোবাসা; সূর্যকে নিয়ে কবিতা লিখতে চাওয়া নয় বছরের বাচ্চা মেয়ে মার্গো। অন্যান্যদের থেকে আলাদা সে, তাই স্কুলের বাকি ছেলেমেয়েরা তাকে হিংসে করে, অকারণে হেনস্থা করে আনন্দ পায়। একদিন হঠাৎ খবর এসে পৌঁছয়, বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন বৃষ্টি থেমে যাবে কয়েক ঘণ্টার জন্য, আকাশে সূর্য উঠবে। কেউ বিশ্বাস করতে চায় না সেকথা; একমাত্র মার্গো-র মধ্যে সূর্য দেখার অদম্য উৎসাহ

প্রকাশ পায়। অপ্রত্যাশিত এক নিষ্ঠুরতার বশবর্তী হয়ে সবাই তখন তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করে, অন্ধকার দেরাজের মধ্যে বন্দি করে শাস্তি দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কথাই সত্যি হয়। অনেকগুলো অবাক চোখের সামনে মেঘ কেটে যায়, তপ্ত ব্রোঞ্জের মতো বিশাল সূর্য জেগে ওঠে মাথার ওপর। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছেলেমেয়েরা ছুটে যায় স্কুলের বাইরে, গ্রীষ্মের রোদের আদর গায়ে মেখে নিজেদের মধ্যে মেতে ওঠে খেলায়। কিন্তু পলকের নিমেষে পেরিয়ে যায় বরাদ্দ সময়; প্রথমে একফোঁটা দুফোঁটা, তারপর চারদিক অন্ধকার করে মুষলধারে বৃষ্টি নামে। সাত বছরের জন্য আবার বিদায় নেয় গ্রীষ্ম। ভাঙা মন নিয়ে স্কুলে ফিরে আসার পরমুহূর্তেই তাদের মনে পড়ে যায় মার্গো আর তার প্রতি হওয়া অবিচারের কথা। অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে দেরাজের দরজা খুলে দিয়ে তারা অপেক্ষা করতে থাকে মেয়েটার বেরিয়ে আসার।

সাদা, কালো, ধূসর ইত্যাদি নানান ক্যানভাসে জীবনকে আঁকলেও সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে জীবনের একটা পর্যায়কেই প্রাধান্য দিয়েছেন ব্র্যাডবেরি—আর তা হল শৈশব। তাঁর চিন্তা, ভাবনা, বোধ সবকিছুই আবর্তিত হয়েছে শৈশবের বিভিন্ন আঙ্গিককে ঘিরে। যৌবন দাবি রাখে, মধ্যবয়স সবকিছুর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা খোজে, কিন্তু শৈশব নিষ্কলুষ, সে শুধু অনুভব করে। শিশুরা কখনও উষ্ণ, কখনও শীতল, কখনও উৎসাহী আবার কখনও অবজ্ঞাপ্রবণ; কিন্তু সবসময়ই কৌতূহলী, রূপ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের মাধ্যমে বুঝে নিতে ইচ্ছুক পরিপার্শ্বের স্বরূপ। তাই হয়তো শিশুদের প্রতি ব্র্যাডবেরি-র এত টান; এতটাই যে তাঁর গল্পের প্রাপ্তবয়স্ক, অভিজ্ঞ চরিত্ররাও প্রায়শই শিশুসুলভ আচরণ করে--কখনও সরলতা, আবার কখনও বা ভয়ের চোখে দেখে জগৎ-সংসারকে। 'দ্য আর্থ মেন' গল্পে মঙ্গলের বুকে পাড়ি দেওয়া অভিযাত্রী থেকে 'আ সাউন্ড অফ থাণ্ডার' গল্পে ডাইনোসর শিকার করতে জুরাসিক যুগে গিয়ে পৌঁছোন শিকারীর দল—সবাই যেন 'যেমন খুশি সাজো' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা শিশু—মহাকাশচারী বা সময়ান্তরের যাত্রী সেজে বইয়ের পাতায় অভিনয় করছে। কখনও কখনও এই চরিত্ররা একমাত্রিক হয়ে পড়ে, বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়, কিন্তু তাও পাঠক ব্র্যাডবেরি-কে অবহেলা করতে পারেন না, কারণ শত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও, শৈশবের হাতছানি বড়ই মধুর।

মহিলা এবং বৃদ্ধদের নিয়ে লেখার সময়ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ব্র্যাডবেরি দেন, কারণ নারীত্ব এবং প্রৌঢ়ত্ব ব্র্যাডবেরি-র কাছে শৈশবেরই আরেক রূপ। 'ফারেনহাইট 451' নভেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, সতেরো বছরের কিশোরী ক্ল্যারিস ম্যাক্লেলান-এর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে একের পর এক বিশেষণের ফুল ফোটান লেখক, ঝর্নার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে— "...her eyes were two miraculous bits of violet amber that might capture and hold him intact. Her face, turned to him now, was fragile milk crystal with a soft and constant light in it." বৃদ্ধদের চরিত্রায়নের ক্ষেত্রে নরম, পেলব রঙ ব্যবহার করেন, আশ্রয় নেন সহমর্মিতার। 'দ্য ডে ইট রেইনড ফরএভার' গল্পে বৃদ্ধ মিঃ টার্লে যখন অবাক হন, সেই ভঙ্গিমাও তাই হয়ে ওঠে একান্তই শিশুসুলভ—"Mr Terle's eyes grew wider and yet wider to take hold of what was coming. He held to the porch rail like the captain of a long-becalmed vessel feeling the first stir of some tropic breeze that smelled of lime..."

রে ব্র্যাডবেরি-কে নিয়ে লিখতে বসলে বক্তব্য ফুরোতেই চায় না। কিন্তু কোথাও না কোথাও তো থামতেই হয়, যেমন থেমেছেন ব্র্যাডবেরি স্বয়ং, 2012 সালের 5 জুন কল্পবিজ্ঞানপ্রেমীদের কাঁদিয়ে যাত্রা করেছেন না ফেরার দেশে। পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে তাঁর দেহ, কিন্তু আমরা ভাগ্যবান, তাঁর সাহিত্যকর্ম, তাঁর অমূল্য সৃষ্টির ডালি আমাদের জন্য থেকে গিয়েছে। সাদা কাগজের গায়ে কালো কালিতে ছাপা তাঁর উত্তরাধিকার, তাঁর চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতির নির্যাস রয়েছে আমাদের নাগালের মধ্যেই, শুধু হাত বাড়িয়ে বইয়ের পাতাগুলো উলটে দেখার অপেক্ষা। আর তাই মাঝে মাঝে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, মারা যাননি রে ব্র্যাডবেরি, বরং রয়েছেন আমাদের মধ্যেই, তাঁর প্রিয় মঙ্গলগ্রহ, ওয়াকিগেন এবং আদুরে শৈশবের নরম ছায়ায়। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, গত 22শে আগস্ট, 2025 105তম জন্মবার্ষিকী পূরণ করা ইলিনয়ের জাদুকর অতীত হবেন না কোনওদিনই, বরং অমর অক্ষয় হয়ে থাকবেন আমাদের মনের মণিকোঠায়, শুকতারার উজ্জ্বলতা নিয়ে। ◆

তথ্যসূত্রঃ

১। 'When I was in kneepants: Ray Bradbury', Damon Knight
২। 'Bradbury on Children', Lahna Diskin
৩। 'Ray Bradbury Stories', volumes 1&2, Ray Bradbury

লেখক শ্রী সৌভিক চক্রবর্তী স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড—ইস্কো স্টিল প্ল্যান্ট সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার এবং কল্পবিজ্ঞান ও ফ্যান্টাসি সাহিত্যের চর্চাকারী।
ইমেলঃ souvik.chakraborty875@gmail.com

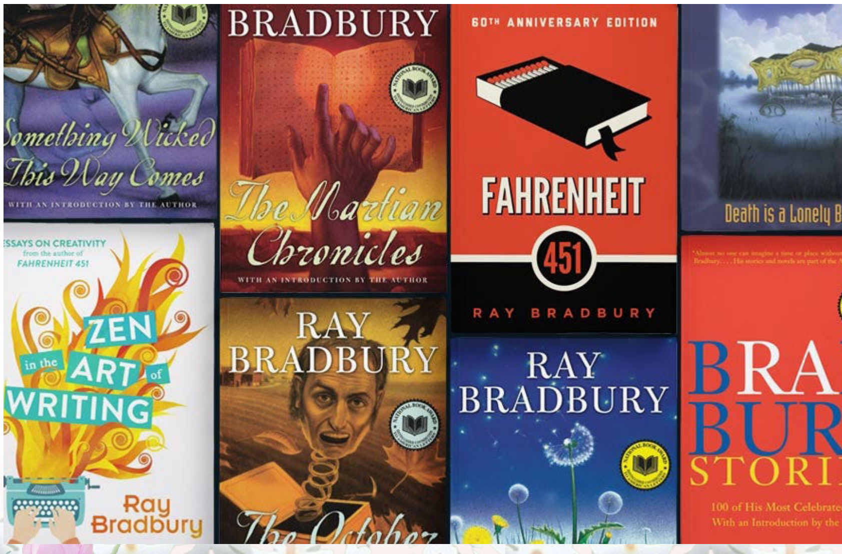

জীবন্ত-শিল্প

অরুনিমা ভৌমিক

"আপন মনের মাধুরী মিশায়ে করেছি তোমারে রচনা..."

প্রতিটি শিল্পই তার রূপ-রস নিয়ে বিশ্ব দরবারে সমাদৃত হয়, যা আসলেই শিল্পীর দীর্ঘ সময়ের সাধনা আর অধ্যাবসায়ের ফসল। চীন ও জাপানের এমনই এক জনপ্রিয় শিল্প হল বনসাই শিল্প। বনসাই আসলে বৃহৎ প্রকান্ড গাছের ক্ষুদ্র সংস্করণ। বলা যেতে পারে, বৃক্ষকে বামন করে রাখার প্রচেষ্টা। পরিণত উদ্ভিদ অথচ আকারে বেশ ছোট। এমন গাছ প্রস্তুত করতে সময় লাগে বেশ কয়েক বছর। মুলত গাছের প্রাণ থাকায় এই শিল্পের আরও এক নাম জীবন্ত শিল্প। ছোট্ট পাত্রে বৃক্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ শোভা পায় অনেকের ই বাড়িতে যা আসলেই সময় সাপেক্ষ যা শিল্পীর বিচক্ষনতা ও ধৈর্য্যের পরিচায়ক। ছোট পাত্র বা ট্রে জাতীয় পাত্রে এই শিল্প করার প্রচলন থাকায় এই শিল্পের আরও এক নাম ট্রে প্লান্টিং শিল্প। আমাদের লোকালয়ে পাওয়া যায় এমন কোনও বৃক্ষ-জাতীয় গাছকে ছোটো করে অথবা কোনও পশু-পাখির রূপদান করাই হল বনসাই শিল্প।

এরপর আসা যাক এই শিল্পের ইতিহাসে। বনসাই শব্দের উৎপত্তি 'পুন-সাই' যেখানে 'পুন' শব্দের অর্থ হল মাটি বা ধাতুর তৈরী পাত্র। আর 'সাই' বলতে মুলত বৃক্ষজাতীয় গাছ কে বোঝায়। জনৈক জাপানী পুরোহিত কোকান শিরেনের লেখা এক বইয়ে বনসাই শিল্পকে 'বনছেকি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আবার কিছু কিছু জাপানী গ্রন্থে বনসাই কে 'হাচি-নো-কি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্থ হল গামলার গাছ। কথিত আছে, আজ থেকে প্রায় দশহাজার বছরের ও আগে এই বনসাই শিল্পের প্রচলন হয় জাপানে Yin ও Zhou এর হাত ধরে ... পরে সেখান থেকেই চীনে বনসাই শিল্পের প্রবর্তন ঘটে ছং রাজবংশের হাত ধরে এবং ধীরে ধীরে এই শিল্প চীনে খুব বিখ্যাত হয়। চিন দেশেই প্রথম বহুমুল্য উপহার হিসেবে বনসাই এর প্রবর্তন বলে মনে করা হয়। তবে বনসাই যত পুরোনো হয় তার মূল্য তত বেশী বাড়তে থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় মিশরে ও এই শিল্পের প্রচলন হয় প্রায় চার হাজার খ্রীষ্টপুর্বাব্দে, তবে তারা এই শিল্পের জন্য ব্যবহার করতেন কেবলমাত্র পাথরের পাত্র। বনসাই শিল্পের উৎপত্তি চীন-জাপান-ভিয়েতনাম-মিশরে হলেও বর্তমানে তা সারা বিশ্বে সমাদৃত। আর এই শিল্প ও গাছের প্রতি ভালবাসা ভারতে আসে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের হাত ধরে কয়েক হাজার বছর আগে।

পরবর্তী প্রসঙ্গ হল, বনসাই এর জন্য উপযুক্ত গাছ নির্বাচন। এক্ষেত্রে, অবশ্যই আমাদের আঞ্চলিকতা কে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। অর্থাৎ, আশেপাশের সহজলভ্য, বহুবর্ষজীবী কাষ্ঠল প্রকৃতির, পুরু কর্টেক্সযুক্ত বৃক্ষগুলি নির্বাচন করা প্রয়োজন। বিদেশী গাছগুলি সহসা আমাদের পরিবেশের সাথে মানিয়ে নিতে পারেনা তাই স্বভাবতই তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় আর তারপর ও ছোট করে রাখার চাপ তারা নিতে পারে না, তাই বাইরের দেশের গাছগুলি এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। অর্থাৎ জাপানে ওক, ম্যাপল,পাইনের সহজলভ্যতার কারণে ওই অঞ্চলে এই গাছগুলির বনসাই দেখা গেলেও ভারতীয় উপমহাদেশে বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, তেঁতুল, আম প্রভৃতি গাছের বনসাই-এর জনপ্রিয়তা বেশি। বনসাই তৈরীর প্রক্রিয়ায় আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তা তেমন প্রয়োজন হয় না। সাধারণত গাছগুলি বীজ থেকে সৃষ্ট হওয়ার কিছু বছর অবধি তাকে স্বাভাবিক ছন্দেই বাড়তে দেওয়া হয় তারপর গাছের গৌণ-বিভাজন শুরু হলে অর্থাৎ ধীরে ধীরে গুঁড়ি কাষ্ঠল হলে বনসাই এর

পৃথিবীর প্রাচীনতম বনসাই (চিত্র সূত্র- ইন্টারনেট)

জাপানী গ্রন্থে পাওয়া বনসাই এর উৎপত্তির ইতিহাস (চিত্র সূত্র- ইন্টারনেট)।

দেশীয় বনসাই

প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়। এক্ষেত্রে গাছগুলির উচ্চতা এক থেকে দেড় মিটার এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়। নির্দিষ্ট আকারের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় ডাল রেখে বাকি ডাল কেটে ফেলা হয়। এবং ছোট পাত্রে মূলের বৃদ্ধি সীমিত রাখতে প্রধান মূলও কেটে ফেলা হয়। কখনও কখনও মূলগুলিকে ও নির্দিষ্ট আকার প্রদান করা হয়। গাছের বৃদ্ধি রুখতে মুলত কম উর্বর মৃত্তিকা ই বনসাই এর উপযুক্ত। প্রয়োজনীয় আকার প্রদানের জন্য অনেক ক্ষেত্রেই ধাতব তার ব্যবহার করা হয়, যা স্বার্থ পুরনের পরই গাছ থেকে খুলে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

বনসাই সৃষ্টির পেছনে প্রধান দুটি উদ্ভিদ হরমোন অক্সিন ও সাইটোকাইনিনের অবিরাম দ্বন্দ্ব চলে। যখন গাছের ডাল-পালা লম্বায় বাড়ছে তখনই অক্সিনের রাজত্ব চলে। কিন্তু এ যে বামনগাছ! লম্বায় বেড়ে ওঠা মানা। আর ঠিক তখনই শিল্পের অবধারিত নিয়মে স্বল্প স্থানেই গাছকে ঝোপালো করতে ডালপালার মাথা-কাটা পড়ে। অক্সিনের রাজত্ব ক্ষণিকের জন্য শেষ হয়। আর ঠিক সেই সময় পার্শ্বীয় বৃদ্ধি ঘটাতে অর্থাৎ একটি ডাল থেকে দুটো বা দুটো থেকে চারটে ডাল সৃষ্টির দায়ভার গিয়ে পড়ে স্বয়ং সাইটোকাইনিনের উপর ... সেই ডাল গুলি একটু বড় হতেই আবার ও অগ্রমুকুলে অধিষ্ঠিত হন স্বয়ং অক্সিন। আবার ও গাছের ডাল বেড়ে ওঠে আর ছাঁটাই হয়। এভাবেই অক্সিন আর সাইটোকাইনিনের চক্রাকার আবর্তনে গাছ হয়ে ওঠে পরিণত অথচ খর্ব। এছাড়াও PIN প্রোটিন গুলির ও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রয়েছে এই শিল্পে।

পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট বনসাই হল ম্যামে বনসাই। যার আক্ষরিক অর্থ হল ক্ষুদ্রাকৃতি। এর উচ্চতা 2.5 সেমি। একটি বনসাই যা শিশুর হাতের তালুতে ও ধরে যাবে। সবচেয়ে দামি বনসাইটি হল সার্জেন্ট জুনিপার বনসাই, যার বর্তমান মূল্য প্রায় 2 কোটি মার্কিন ডলার ধার্য্য করা হয়েছে।এটির বয়স প্রায় এক হাজার বছর। বর্তমানে ইতালি শহরের এক জাদুঘরে সবচেয়ে পুরোনো বনসাই টি রাখা আছে যার বয়স আনুমানিক এক হাজারের বছরের ও বেশী। এই বনসাইটির নাম ক্রেসপি বনসাই যা মুলত *Ficus retusa* বৃক্ষের বনসাই। এর আনুমানিক উচ্চতা প্রায় দশ ফুট এবং এর প্রধান আকর্ষণ হল এর প্যাঁচালো স্তম্ভ মূল। এটি জাপানের তাইওয়ান থেকে আনয়ন করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। জাপানের টোকিও শহরের এক প্রাসাদে কয়েক শত বছরের পুরোনো বনসাই গুলিকে ওই দেশের জাতীয় সম্পদ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

অনেকের মতেই বাগানপ্রেমীরা নাকি এভাবেই গাছকে তার আপন ছন্দে বেড়ে ওঠায় বাধা দান করেন। কিন্ত সাধারণত গাছগুলির সংগ্রহ করা হয় কোনও অবহেলিত স্থান থেকেই। তবে একথা অনস্বীকার্য যে,জীবন্ত শিল্প বা ট্রে প্লান্টিং শিল্প যাই বলা হোক না কেন বামন গাছের পরিপূর্ণতার জন্য যেমন গাছের প্রতি ভালবাসা, শিল্পের প্রতি অনুরাগ প্রয়োজন। তেমন ই যেকোনো কারোর মনে এমনকী শিশু মন কে শান্ত করতে এবং শিশু কে প্রকৃতি ও শিল্পের প্রতি অনুরক্ত করতে বনসাই এর সাহায্য নেওয়া যেতেই পারে। এমনকী, অবসরের ক্লান্তি দুরীকরণে বা বাড়ির আভিজাত্য প্রকাশে বনসাই এর জুড়ি মেলা ভার। ◆

*লেখিকা **কুমারী অরুণিমা ভৌমিক** একজন বিজ্ঞান লেখিকা ও লোকবিজ্ঞান প্রচারক।*
ইমেল: arunimabhaumik10@gmail.com.

মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিষ্কারের ইতিহাস

অসিত চক্রবর্তী

‘মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সনাক্তকরণ এক নতুন যুগের সূচনা’

—গ্যাব্রিয়েলা গঞ্জালেস, অধ্যাপক,
লুইসিয়ানা রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞানের যেকোন আবিস্কার সৌধের স্থপতি হিসেবে প্রচারিত হয় সামান্য এক বা দু'জন বিজ্ঞানীর নাম। কিন্তু সুউচ্চ ঐ ইমারতের নীচের ধাপগুলো তৈরির পেছনে থাকে কয়েক দশক, এমনকি শতক, ব্যাপী অসংখ্য গবেষণা কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম। কাল চক্রে এঁদের অনেকের নাম ইতিহাসে আদৌ লিপিবদ্ধ হয় না। আবার অনেকের গবেষণা প্রসূত ফলাফল সর্বশেষ প্রমাণিত তথ্যের পরিপন্থী হবার কারণে তাঁরা উপেক্ষিতই থেকে যান। অথচ বুদ্ধিমান যেকোন ব্যক্তি জানেন যে তাঁদের সামান্যতম সফল বা বিফল গবেষণাও নিশ্চিতভাবেই পরবর্তী পণ্ডিতবর্গকে সঠিক দিশা দেখিয়েছে। এমনকি পরিশেষে যিনি আবিষ্কারকের শিরোপা পান তাঁর দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের পথে কখনো এসেছে সফলতা, কখনো হতাশার গ্লানি। অতর্কিত কয়েকটা ক্ষেত্র ছাড়া সব আবিষ্কারের পেছনে প্রথমে থাকে যুক্তিনির্ভর কিছু অনুমান। তারপর প্রচেষ্টা শুরু হয় তা' প্রমাণের জন্য। একবিংশ শতকের বর্তমান সময় পর্যন্ত এমনি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। বিজ্ঞানে ন্যূনতম জ্ঞানসম্পন্ন যেকোন ব্যক্তিকে এর তাত্ত্বিক আবিষ্কারকের নাম জিজ্ঞেস করলে ঝটিতি তিনি উত্তর দেবেন, আলবার্ট আইনস্টাইন (A Einstein ; 1879–1955)। সঠিকতার বিচারে এই উত্তর একশো শতাংশ ঠিক। কেননা তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের অনেক অনুসিদ্ধান্তের মধ্যে এই তরঙ্গ একটা। কিন্তু এই প্রয়াসের শুরু আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড়শো বছর আগে।

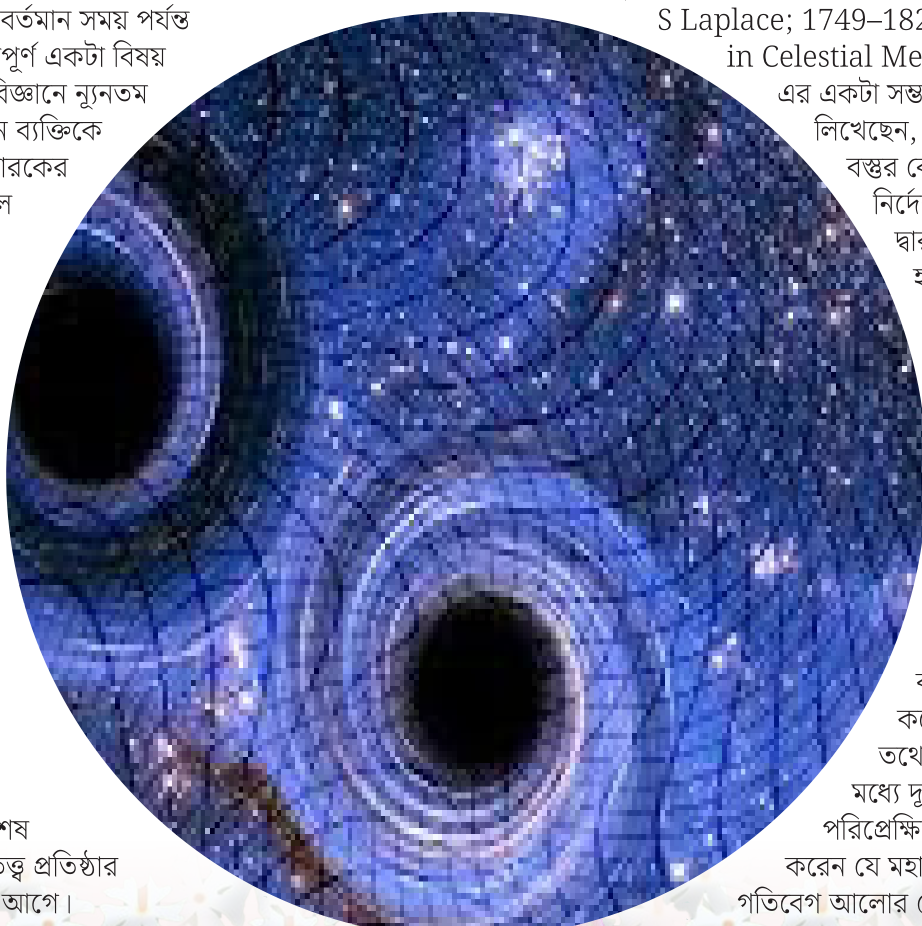

1687 সালে নিউটন (I Newton; 1643–1727) মহাকর্ষ সূত্র প্রস্তাব করেন। এর আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল, একমাত্র দুটি বস্তু পরস্পর সংস্পর্শে থাকলে তবেই একে অন্যের উপর বল প্রয়োগ করতে পারে। শূন্য স্থানে এর প্রভাব সম্ভব নয়। স্বভাবতই নিউটনের সূত্র প্রস্তাবনার পরে সবাই জানতে চাইলেন, শূন্যে এটা কিভাবে সম্ভব? এবিষয়ে নিউটনের বিখ্যাত উত্তর ছিল, ‘hypotheses non fingo (লাতিন শব্দ , যার অর্থ, আমি অনুমান করি না ..., কিন্তু এটা ঠিক যে ঐ সূত্র কাজ করে)’। যদিও তাঁর নিজের কাছেই উত্তরটা অস্বস্তিকর ছিল। ধর্মতত্ত্ববিদ বেন্টলেকে (E Bentley; 1662–1742) তিনি লিখেছেন, ‘শূন্যে কোন মাধ্যম ব্যতিরেকে একটা বস্তু অন্য দূরের একটা বস্তুর উপর ক্রিয়া করে ... (এটা) আমার কাছে এত অযৌক্তিক যে আমার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি দার্শনিক ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তাশীল তিনি এটা বিশ্বাস করবেন না’। 1693 সালে নিউটনের বন্ধু হ্যালি (E Halley; 1656–1742) গত কয়েক হাজার বছরের চন্দ্র গ্রহণের নথি ঘেঁটে দেখেন যে চাঁদের কৌণিক বেগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সূত্রে 1776 সালে লাপলাস (P S Laplace; 1749–1827) A Treaties in Celestial Mechanics বইতে এর একটা সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে লিখেছেন, ‘যদি আকর্ষণকারী বস্তুর কেন্দ্রের দিকে নির্দেশক প্রবাহীর আবেগ দ্বারা মহাকর্ষ উৎপন্ন হয়, তাহলে ..... আকর্ষণকারী বলের ধারাবাহিক সংক্রমণের উপর নির্ভর করে ......’। অর্থাৎ তিনি ইথারের মতো একটা মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে মহাকর্ষ বল প্রবাহের কথা অনুমান করেছিলেন। হ্যালির তথ্যে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে দূরত্ব পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি প্রমাণ করেন যে মহাকর্ষীয় বল প্রবাহের গতিবেগ আলোর বেগের তুলনায়

প্রায় এক কোটি গুণ বেশি। অবশ্য তাঁর মতে এই প্রবাহের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ‘একেবারে শূন্যের দিকে একটা অদৃশ্য সময়ের তুলনায় অসীম দূরে’। যাহোক, পুনর্গণনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে এসব তত্ত্ব নাকচ হয়ে যায়। এরপর 1820–50 অধ্যায়ে প্রবাহী গতি বিদ্যায়, বিশেষত নেভিয়ার স্টোকসের (C Navier; 1785–1836, G Stokes; 1819–1903) কাজের সূত্রে, গতি- চাপ ইত্যাদি রাশিগুলোর বেলায় ঐ রাশিগুলোর ‘ক্ষেত্রে’র ধারণা প্রচলিত হয়। 1865 সালে ম্যাক্সওয়েল (J C Maxwell ; 1831–79) তাঁর বিখ্যাত ও সুদূরপ্রসারী তড়িচ্চুম্বকীয় প্রভাব সংক্রান্ত মূল চারটে সমীকরণ প্রকাশ করেন। প্রমাণিত হয় যে আলো হল সময়ের সাথে পরস্পর অভিলম্ব তড়িৎ ও চুম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনের ফলশ্রুতি। আর আলো যে বল প্রয়োগ করে তা’ সকলের জানা। সুতরাং মহাকর্ষীয় বলের পেছনে কোন ‘ক্ষেত্র’ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষত যখন মহাকর্ষ, চুম্বক ও তড়িৎ এই তিন বলের ক্ষেত্রেই কোন বিন্দুতে তীব্রতা উৎস থেকে ঐ বিন্দুর দূরত্বের বর্গের ব্যাস্তানুপাতিক। ম্যাক্সওয়েল নিজেই এব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন, ‘চারদিকের মাধ্যমের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণের পরে ..... স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, মহাকর্ষীয় আকর্ষণও .... চারদিকের মাধ্যমের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা, অর্থাৎ মহাকর্ষকেও কোন ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত করা যাবে নাতো’? ম্যাক্সওয়েলের দেয়া এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে 1893 সালে পদার্থবিদ ও ইঞ্জিনিয়ার হেভিসাইড (O Heaviside; 1850–1925) ম্যাক্সওয়েলের তড়িচ্চুম্বকীয় সমীকরণের ধাঁচে চারটে মহাকর্ষীয় সমীকরণ তৈরি করেন এবং মহাকর্ষীয় বলের প্রবাহ সম্পর্কিত একটা তরঙ্গ সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করেন (চিত্র নং 1)। তিনি দেখান যে পৃথিবী আর সূর্য

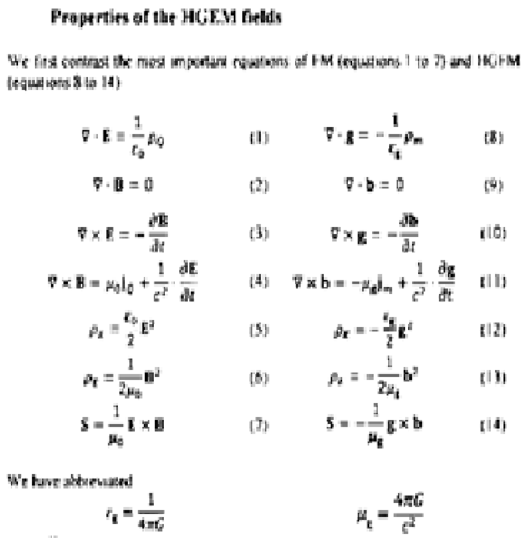

Properties of the HGEM fields

We first contrast the most important equations of EM (equations 1 to 7) and HGEM (equations 8 to 14)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho_Q \quad (1) \qquad \nabla \cdot \mathbf{g} = -\frac{1}{\epsilon_g}\rho_m \quad (8)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \quad (2) \qquad \nabla \cdot \mathbf{b} = 0 \quad (9)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (3) \qquad \nabla \times \mathbf{g} = -\frac{\partial \mathbf{b}}{\partial t} \quad (10)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j}_Q + \frac{1}{c^2}\cdot\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4) \qquad \nabla \times \mathbf{b} = -\mu_g \mathbf{j}_m + \frac{1}{c^2}\cdot\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial t} \quad (11)$$

$$\rho_E = \frac{\epsilon_0}{2}E^2 \quad (5) \qquad \rho_g = -\frac{\epsilon_g}{2}g^2 \quad (12)$$

$$\rho_B = \frac{1}{2\mu_0}B^2 \quad (6) \qquad \rho_b = -\frac{1}{2\mu_g}b^2 \quad (13)$$

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\mu_0}\mathbf{E} \times \mathbf{B} \quad (7) \qquad \mathbf{S} = -\frac{1}{\mu_g}\mathbf{g} \times \mathbf{b} \quad (14)$$

We have abbreviated

$$\epsilon_g = \frac{1}{4\pi G} \qquad \mu_g = \frac{4\pi G}{c^2}$$

চিত্র নং 1: এখানে দুটি শ্রেণিভুক্ত সমীকরণের তুলনা করা হয়েছে। বাঁদিকের সারণিতে সাতটি [1 থেকে 7] তড়িচ্চুম্বকীয় সমীকরণ আর তাদের সঙ্গে তুলনীয় সাতটি HEGM সমীকরণ [8 থেকে 14] ডান দিকের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

পরস্পর গতিশীল হলে তাদের মধ্যে মহাকর্ষীয় প্রবাহ সৃষ্টি হয় এবং সূর্যের কক্ষপথের স্থানচ্যুতি ঘটায়। কিন্তু এই চ্যুতি খুব কম হবার কারণে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এই মহাকর্ষীয় বল প্রবাহের সর্বাধিক গতি প্রায় আলোর বেগের সমান। কিন্তু যেকোন কারণেই হোকনা কেন তাঁর এই তত্ত্ব তেমন জনপ্রিয় হয়নি। হেভিসাইড স্কুল কলেজের প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ পাননি। তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত। পরে তিনি এবিষয়ে স্বীকার করেছেন, ‘আমার সাধ্যমত ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব বুঝতে আমার অনেক বছর সময় লেগেছে। তারপর আমি সেগুলো পাশে সরিয়ে রেখে নিজের মতো এগোই’। তাছাড়া তিনি নিজের ঘর থেকেই সব কাজকর্ম করতেন ও কারো সাথে তেমন মেলামেশা করতেন না। পরবরতীকালের আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার টেন্সর সমীকরণের মতো তা সম্পূর্ণ না হোলেও মহাকর্ষীয় বল প্রবাহের একটা ব্যাখ্যা তিনি দেন এবং অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ্যতার কারণে এখনো কোন কোন স্কুল কলেজে পড়ানো হয়। 1898 সালে গারবার (P Gerber; 1854–1909) তাঁর একটা গবেষণা পত্রে মহাকর্ষীয় বিভবের প্রবাহ সংক্রান্ত একটা তত্ত্ব প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি প্রমাণ করেন যে এর গতিবেগ আলোর বেগের প্রায় সমান। সেসময়ে বিজ্ঞানীদের কাছে বুধ গ্রহের অনুসুরের ক্রমস্খলনের (perihelion shift of Mercury) পরিমাণের একেবারে সঠিক ব্যাখ্যা ছিল না। নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রানুসারে শুক্র, পৃথিবী ও বৃহস্পতি গ্রহের প্রভাবে এর মান নির্ধারিত হয়েছিল ICRF (International Celestial Reference Frame) নির্দেশতন্ত্রের সাপেক্ষে প্রতি একশো বছরে প্রায় 531 আর্ক সেকেন্ড, যদিও বাস্তবে তা’ ছিল প্রায় 574 আর্ক সেকেন্ড। অর্থাৎ, কক্ষপথে বুধের ঘূর্ণন অভিমুখে অনুসুরের প্রায় 43 আর্ক সেকেন্ড অতিরিক্ত গতির সঠিক কারণ তখন জানা ছিল না। কিন্তু উপরোক্ত গারবারের তত্ত্বানুযায়ী এর যে মান পাওয়া গেল তা প্রকৃত মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমনকি আশ্চর্যের ব্যাপার, পরবর্তীকাল দেখা গেছে যে গারবারের তত্ত্বানুসার পাওয়া এই মান এবং ভবিষ্যতে পাওয়া আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বানুযায়ী মান একেবারে এক। গারবার প্রমাণ করলেন যে মহাকর্ষীয় বিভবের বেগ ও আলোর বেগ সমান। যদিও এই তত্ত্বে বেগের সাথে ভরের পরিবর্তন ধরা হয়নি (তখন এটা জানাও ছিল না)। আর গারবারের তত্ত্বানুযায়ী সূর্যের পাশ ঘেঁষে যাওয়া আলোর বিক্ষেপের মান গণনা করে দেখা গেল সেটা বাস্তব মানের চাইতে অনেক বেশি। অবশ্য এটাও ঠিক, গারবারের প্রস্তাবিত মহাকর্ষীয় বিভব আদৌ যান্ত্রিক ছিল না। নিজেই এবিষয়ে লিখেছেন, ‘যান্ত্রিক কোন তত্ত্ব মহাকর্ষীয় বেগের সমস্যা আদৌ সমাধান করতে পারে না’।

যাহোক, হেভিসাইড ও গারবারের কাজ সম্পর্কে পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের কোন বিবৃতির উদাহরণ পাওয়া যায় না। 1901 সালে জার্মান পদার্থবিদ ও বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী জেনেক (J Zenneck; 1871–1959) একটা জার্মান শব্দকোষের জন্য মহাকর্ষের উপর তৈরি একটা নিবন্ধে সমসাময়িক গবেষকদের কাজ পর্যালোচনা করে পরে নিজের কিছু কাজ যোগ করেছিলেন। পরিশেষে তিনি মন্তব্য

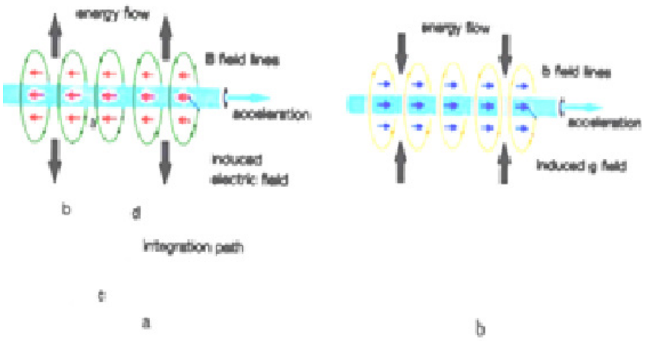

চিত্র নং 2: (a) একটি আধানযুক্ত দন্ড সমত্বরণ নিয়ে চলেছে। এর ফলে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হচ্ছে, এবং শক্তি দন্ডের থেকে ক্ষেত্রে চলে যাচ্ছে। (b) HGEM সঙ্গে তুলনা করলে, যখন ক্ষেত্র গড়ে উঠছে, তখন শক্তি ক্ষেত্র থেকে দন্ডের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

করেছিলেন, '(এখন পর্যন্ত) মহাকর্ষকে অন্যান্য ঘটনার সাথে সম্পর্কিত করার সব প্রয়াস নয় ব্যর্থ, অথবা এখনো অধরা হিসেবে ধরে নিতে হবে'। 1905 সালে পয়েনকেয়ার (H Poincare; 1854–1912) প্রথম মহাকর্ষীয় তরঙ্গ (ondes gravifiques) নামটা প্রস্তাব করেন। তিনি মূলত তড়িচ্চুম্বকীয় তত্ত্ব ও ইলেকট্রনের গতি নিয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেন, যেমন কোন আধান ত্বরান্বিত হোলে তড়িচ্চুম্বকীয় বিকিরণ বিচ্ছুরিত হয় তেমনি কোন ভর ত্বরান্বিত হোলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নির্গত হয় (চিত্র নং 2)। এজন্য তিনি লোরেঞ্জের (H Lorentz; 1853–1928) রূপান্তর সমীকরণগুলো নতুন আঙ্গিকে ব্যবহার করেন। এটা ঠিক যে তাঁর প্রস্তাবিত তত্ত্ব পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের দেয়া তত্ত্বের মতো সুদূরপ্রসারী নয়। তাঁর তত্ত্ব লোরেঞ্জ রূপান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশ তন্ত্র নিরপেক্ষ হোলেও সাধারণভাবে যেকোন নির্দেশ তন্ত্রের সাপেক্ষে নয়। পয়েনকেয়ারের কাজ অনেকটাই বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত। অনেকে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কৃতিত্ব আইনস্টাইনের সাথে পয়েনকেয়ারকেও দিতে চান। অন্তত সেই পর্বে আইনস্টাইন ও পয়েনকেয়ার দুজনের কেউ অন্য জনের কাজের প্রসঙ্গ তাঁদের নিজেদের সংশ্লিষ্ট কাজে আলোচনা করেননি। যদিও পরবর্তীকালে পণ্ডিতেরা তাঁদের কাজে একে অপরের প্রভাব খুঁজে পেয়েছেন। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে আইনস্টাইন একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'ম্যাক্সওয়েল সমীকরণ বিশ্লেষণের জন্য লোরেঞ্জ নামাঙ্কিত রূপান্তর অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং পয়েনকেয়ারের অন্তর্দৃষ্টি তা আরো গভীর (ভাবে প্রতিষ্ঠা) করেছে'।

এদিকে 1905 সালে স্থির অথবা সমবেগে ধাবমান নির্দেশ তন্ত্রের উপযোগী বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব পেশ করবার পরে আইনস্টাইন ব্যস্ত হোয়ে উঠলেন ত্বরান্বিত নির্দেশ তন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। 1907 সালে তাঁর মাথার এলো তাঁর নিজের ভাষায় 'luckiest thought'। সহজে সেটা হোল এই যে এক ব্যক্তি যখন পৃথিবীর অভিকর্ষজ বলে নীচে পড়ে তখন সে নিজেকে ভারশূন্য অনুভব করে। অর্থাৎ, ত্বরান্বিত নির্দেশ তন্ত্রে আবদ্ধ একজন ব্যক্তি কোন পরীক্ষা করে নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না যে তিনি কোন ত্বরান্বিত নির্দেশ তন্ত্রে আছেন অথবা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রে অবস্থান করছেন। একথা অনস্বীকার্য যে তিনি বিশেষ আপেক্ষিকতা সম্পর্কিত মিনকাউস্কির (H Minkowski; 1864–1909) দেশকাল লেখচিত্র দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। আইনস্টাইন নিজেও তা স্বীকার করেছেন। হয়তোবা তখন থেকেই আইনস্টাইন মহাকর্ষীয় ঘটনাগুলো মিনকাউস্কির ছবি অনুযায়ী একটা দেশ কালের চিত্রের মাধ্যমে বুঝতে চেষ্টা শুরু করেন। হোতে পারে, তিনি ব্রিটিশ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক ক্লিফোর্ডের (W Clifford ; 1845–79) গ্রন্থ On the Space Theory of Matter দ্বারা প্রভাবিত হোয়েছিলেন। ঐ গ্রন্থে ক্লিফোর্ড লিখেছেন, 'বস্তুর (ও শক্তির) উপস্থিতি আসলে স্থানের উপর চড়াই (ও উৎরাই)। আর বস্তুর গতি হল স্থানের বক্রতা পরিবর্তন; তা' দেখা যাক বা না যাক'। এমনকি ক্লিফোর্ড এও লিখেছেন যে সাধারণ ইউক্লিডীয় জ্যামিতি সেখানে প্রযোজ্য নয়। তিনি অ-ইউক্লিডীও জ্যামিতি, ভেক্টর বিদ্যা, কার্যকারী (operator) ইত্যাদির উপর অনেক কাজকর্ম করেছিলেন। ক্লিফোর্ডের ক্ষেত্রে সন্দেহ থাকলেও পরবর্তীকালে আইনস্টাইনের বক্তব্যে পরিষ্কার যে তিনি জার্মান পদার্থবিদ ও দার্শনিক ম্যাকের (E Mach; 1838–1916) চিন্তাধারায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। 1883 সালে ম্যাক The Science of Mechanics বাইতে লিখেছেন, 'কোন বস্তুর ত্বরণকে বাধা দেবার প্রবণতা নির্ভর করে বিশ্বে অন্যান্য বস্তুর ভর ও তাদের বিন্যাসের উপর। এটা বস্তুর সহজাত ধর্ম নয়'।

1911–12 সালে আইনস্টাইন, ইওটভোস (L Eotvos; 1848–1919) সূত্র (যেখানে ইওটভোস জড় ও মহাকর্ষীয় ভরের সমতা প্রমাণ করেছিলেন) ও আলোর প্রবাহের উপর মহাকর্ষীয় বলের প্রভাব সম্পর্কে দু তিনটে গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। ঐ সময় মহাকর্ষ, আপেক্ষিকতা ও তড়িচ্চুম্বকীয় বিষয়ে এক ঝাঁক বিজ্ঞানীর উল্লেখযোগ্য গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়। এঁদের একজন হোলেন জার্মান পদার্থবিদ আব্রাহাম (M Abraham ; 1875–1922)। এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ত্বরান্বিত আধানের সাথে তুলনা করে তিনি ঘোষণা করেন যে একটা ত্বরান্বিত ভর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বিকিরণ করতে সক্ষম। কিন্তু তাঁর দেয়া তত্ত্বে অনেক ত্রুটি ছিল। যেমন, তাঁর মতে ঐ বিকিরণ তরঙ্গ ছিল অনুদৈর্ঘ্য, যদিও মহাকর্ষীর তরঙ্গ আসলে তীর্যক। তাছাড়া ঐ তত্ত্ব বিশালাকার বস্তুর উপস্থিতিতে আলোর লোহিত সরণ (red shift) ও আলোর গতিপথের চ্যুতি ব্যাখ্যায় অসফল ছিল। অবশ্য আব্রাহাম মহাবিশ্বের অতিরিক্ত ভারী বস্তুর চারদিকে সোয়ারচাইল্ড ব্যাসার্ধ (যে সীমার বাইরে ঐ বস্তু থেকে বিকিরিত আলো বের হোতে পারে না) সম্পর্কে 1916 সালে সোয়ারচাইল্ডের (K Schwarzchild; 1873–1916) দেয়া মূল সূত্র প্রকাশের আগেই অনুমান করেছিলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষায় মহাকর্ষীয় তরঙ্গ প্রমাণ করার চেষ্টাকে 'নিরর্থক (futile)' বলে দাবি করেন। প্রায় একই সময়ে জার্মান পদার্থবিদ মি (G Mie; 1868–1957) মহাকর্ষ, তড়িচ্চুম্বকীয় ও বস্তুর মিলিত একটা একক ক্ষেত্র তত্ত্ব (unified field theory) প্রণয়নে উদ্যোগী হন। তিনি এই ক্ষেত্রের নাম দিয়েছিলেন world function. আব্রাহামের মতোই এখানে মহাকর্ষকে স্কেলার ক্ষেত্র হিসেবে ধরা হয়েছিল।

আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের মূল অঙ্গীকারগুলোও ধরে নেয়া হোয়েছিল। কিন্তু ঐ প্রচেষ্টায় তিনি সফল হননি। আর মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সম্পর্কে তাঁর মত ছিল, এটা এত দুর্বল যে 'যদি কখনো কেউ এর অস্তিত্ব প্রমাণে সমর্থ হয় তবে সেই তরঙ্গের (অস্তিত্বের) তুলনায় যে পদ্ধতিতে তার উদ্ভব হয়েছে সেটা অনেক বেশি কৌতুহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ হবে'। 1913 সালের এক সভায় আইনস্টাইন, আব্রাহামের কাজের প্রসঙ্গ সামান্য আনলেও মি সম্পর্কে কোন আলোচনা করেননি। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মি-এর আক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে আইনস্টাইন প্রাথমিকভাবে সহানুভূতি জানালেও পরে জানান যে তাঁর প্রসঙ্গ আনেননি এজন্য যে মি-এর কাজ সমতা নীতির (principle of equivalence) পরিপন্থী ছিল। এব্যাপারে আইনস্টাইন পরে বিরক্ত হোয়ে বলেছিলেন '(কোন তত্ত্ব গঠনে) কতকগুলো অঙ্গীকার থেকে শুরু করে পরে সেগুলো না মানা আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হয়েছে'। আর আব্রাহামের কাজ সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন, আব্রাহামের মহাকর্ষ তত্ত্ব গাণিতিকভাবে সুন্দর ও সরল হোলেও তা' আপেক্ষিকতার মূল ধারণার পরিপন্থী। বরং তিনি এ সময়ে ফিনল্যান্ডের পদার্থবিদ নর্ডস্ট্রমের (G Nordstrom; 1881–1923) প্রকাশিত এক কাজের প্রশংসা করেছেন। নর্ডস্ট্রম তাঁর কাজে আলোর নিরপেক্ষ বেগ ও সমতা নীতি প্রয়োগ করেছিলেন। বস্তুর প্রভাবে দেশকালের বক্রতারও উল্লেখ করেছিলেন, যদিও গাণিতিকভাবে সীমিত পরিসরে। মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করলেও তিনি অনুমান করেছিলেন যে ঐ তরঙ্গ তীর্যক। অন্যদিকে নর্ডস্ট্রমের তত্ত্ব যেমন সূর্যের প্রভাবে আলোর বিচ্যুতি আদৌ ব্যাখ্যা করতে পারেনি তেমনি তা' বুধের অনুসুরের সঠিক দিকের পরিবর্তে বিপরীতমুখী চ্যুতি প্রমাণ করে।

আইনস্টাইন চাইছিলেন মহাবিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা মহাকর্ষের একটা গাণিতিক ও জ্যামিতিক চিত্র। যা মেনে চলে সমতা নীতি, নির্দেশ তন্ত্র নিরপেক্ষ এবং নিউটনের মহাকর্ষ বলের নতুন ব্যাখ্যায় সক্ষম। অনন্ত মহাবিশ্বের সর্বত্র প্রযোজ্য সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব আবিষ্কারের প্রায় দশ বছর সময়কালের অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত আইনস্টাইন এক পর্বে বন্ধুকে জানিয়েছেন, 'জীবনে এত কষ্ট নিজেকে কোনদিন দেইনি। .... প্রকৃতি আমাদের শুধু একটা লেজ দেখাচ্ছে। আমি নিশ্চিত ঐ লেজটা (একটা) সিংহের। কিন্তু ওর অতিকায় চেহারার জন্য আমরা শুধু লেজটা দেখছি'। এতেই পরিস্কার যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ আবিস্কারের নেপথ্যে তার গভীরতা, জ্যামিতিক ও গাণিতিক জটিলতার ব্যাপ্তি। নিজে একের পর এক প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হোয়ে ও সমসাময়িক পণ্ডিতদের কাজে সীমিত সাফল্য এবং অন্তিম অধ্যায়ে তাঁদের অসফলতার কারণ অনুসন্ধানের পর তিনি বুঝতে পারছিলেন যে সাধারণ ভেক্টরবিদ্যা ও ক্যালকুলাসের সাহায্যে ঐ বিশাল কাজ সম্ভব নয়। ঐ কাজে রিকি (G Ricci; 1853–1925) প্রবর্তিত ও লেভি-সিভিটা (T Levi-Civita; 1873–1941) দ্বারা বিকশিত টেন্সর ক্যালকুলাস ব্যবহার করা প্রয়োজন। কল্পনা করলেন যে সাধারণ দেশকাল চিত্র মিনকাউস্কির বিশেষ আপেক্ষিকতার দেশকাল চিত্রের মত সরল নয়, বরং বক্র। ওখানে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নয়, প্রয়োজন রাইম্যান (B Riemann; 1826–66) জ্যামিতির প্রয়োগ। কিন্তু তখন এসব সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান, অন্তত ঐ ব্যাপক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, ছিল সীমিত। সাহায্য নিলেন ছোটবেলার বন্ধু তথা জুরিখ টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক গ্রজম্যানের (M Grossmann; 1878–1936)। ওসব জ্ঞান আহরণ করতে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হোল। তা' বর্ণনা করতে 1912 সালে সমারফেল্ডকে এক চিঠিতে লেখেন,' ..... আমার জীবনে এত পরিশ্রম আমি করিনি। (এর ফলে) আমি গণিতের, অজ্ঞতাবশত এখন পর্যন্ত যার অংশগুলো ছিল (আমার কাছে) খাঁটি বিলাস সামগ্রী, প্রতি বিরাট সম্মান জানানোর সুযোগ পেয়েছি'। এরপর গ্রজম্যানের সাথে দুটো আর নিজে 1915 সালে প্রুসিয়ান একাডেমী অব সায়েন্সেসের পত্রিকায় পরপর চারটে গবেষণা পত্র প্রকাশ করেন। 1916 সালে ঐ পত্রিকায় Approximate Integration of the Field Equations of Gravity নামক পত্রে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের কথা বলেন, অবশ্য উনি ওর নাম দিয়েছিলেন gravitationswellen. ঐ সালেই তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা সূত্র প্রয়োগ করে সোয়ারচাইল্ড অতি বৃহৎ কোন বস্তুর চারদিকে দেশকাল চিত্র এঁকে একটা ব্যাসার্ধের উল্লেখ করেন। পরবরতীকালে হিলবার্ট একে সোয়ারচাইল্ড ব্যাসার্ধ নামে নামাঙ্কিত করেন। কিন্তু তখনো আইনস্টাইনের মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতি সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। সেসময়ে হতাশ হোয়ে সোয়ারচাইল্ডকে লেখেন, 'তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের মতো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ নেই'। আরো গবেষণার পরে 1918 সালে ঐ তরঙ্গের বেগ, উৎপত্তি, শক্তি সঞ্চালন, দেশকাল বিকৃতি, সমাবর্তন, ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হন। আবার 1936 সালে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থ রোজেনের (N Rosen; 1909–1995) সাথে গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে আইনস্টাইন সন্দেহ প্রকাশ করে Physical Review পত্রিকায় প্রকাশের জন্য একটা পত্র পাঠান। পত্রের নাম ছিল Do Gravitational Waves Exist. ঐ পত্রের পর্যালোচক (reviewer) পুনরায় পরীক্ষার জন্য কিছু পরামর্শ সহ ঐ পত্রটা ফেরৎ পাঠান। পরে জানা যায়, ঐ পর্যালোচকের নাম ছিল রবার্টসন (H Robertsn; 1903–61)। আইনস্টাইন ইনফেল্ডের (L Infeld; 1898–1968) সহযোগিতায় ঐ পত্রে গণনের ত্রুটি দূর করেন এবং পুনরায় মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতি জানান। আপেক্ষিকতা সূত্র আবিস্কারের চূড়ান্ত পর্যায়ে আইনস্টাইনের পাশাপাশি অবশ্যই আর একজনের নাম করা উচিত। তিনি হলেন জগদ্বিখ্যাত গণিতবিদ হিলবার্ট (D Hilbert; 1862–1943)। প্রায় একই বিষয়ে কাজের সূত্রে আইনস্টাইন ও হিলবার্টের মধ্যে যথেষ্ট আলাপ আলোচনা, চিঠি পত্তরের প্রমাণ রয়েছে। কোন কোন সম্মেলনে তাঁরা দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। আপেক্ষিকতার উপর হিলবার্ট তাঁর The Foundations of Physics গবেষণা পত্র গটিনজেন একাডেমীতে প্রকাশনার জন্য জমা দেন 20শে নভেম্বর, 1915 আর সেটা প্রকাশিত হয় 31শে মার্চ, 1916. আইনস্টাইন তাঁর The Field Equations of Gravitation প্রুসিয়ান একাডেমীতে জমা দেন 25শে নভেম্বর, 1915 এবং প্রকাশিত হয় ডিসেম্বর 2, 1915 তারিখে। অর্থাৎ, প্রায় একই বিষয়ে হিলবার্ট তাঁর গবেষণা পত্র আইনস্টাইনের আগে জমা দিলেও সেটা আইনস্টাইনের গবেষণা পত্রের পরে প্রকাশিত হয়। জনান্তিকে একজনের কাজে অন্যজনের কোন কোন তথ্য

বিনা অনুমতিতে নেয়া, ইত্যাদি কাহিনী শোনা গেলেও অন্তত জনসমক্ষে দুজনের কেউ অন্যজন সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেন নি। বরং পরষ্পরের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দুজনের কাজের ঘরানাও ছিল আলাদা। হিলবার্ট মূলত গণিতের ফ্রেমে ঘটনার প্রকৃতি উদ্ধারের প্রয়াস করেছেন; আইনস্টাইন প্রাকৃতিক ঘটনা সমূহ সামনে রেখে তা উদ্ধারে গণিত ব্যবহার করেছেন।

আশ্চর্যজনক হোল, 1920 সাল থেকে প্রায় আইনস্টাইনের মৃত্যু পর্যন্ত সাধারণ আপেক্ষিকতা নিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কাজ হয়নি। এব্যাপারে বিখ্যাত আপেক্ষিকতা বিষয়ক পদার্থবিদ রিন্ডলারের (W Rindler; 1924–2019) উক্তি, 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ দীর্ঘদিন মূলত একটা মৃত বিষয় ছিল। মানুষ এটাকে একটা সুপ্ত বিজ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করেছিল'। অবশ্য এর পেছনে কিছু যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছিল। প্রথমত, আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কীয় আইনস্টাইনের টেন্সর সমীকরণগুলো আত্মস্থ করে মহাবিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার চিত্র এঁকে তা ব্যাখ্যা করার মতো উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা সেসময় প্রধানত জার্মানির বিভিন্ন উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণাগারে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু সেখানে সমস্যা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ধাক্কা, পরবর্তীকালে বিশেষত যুক্তিবাদী বিজ্ঞানীদের উপর হিটলারের নাৎসী বাহিনীর অত্যাচার ও তার পরিণামে তাঁদের জার্মানি ত্যাগ, পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার প্রভাব, ইত্যাদি। হয়তো আর একটা কারণ এর সাথে যুক্ত। আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বনুযায়ী দেশকাল চিত্রের বিকৃতি বা মোচড়ের প্রভাবের সবটা অনুমান করতে এবং পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করতে মহাজাগতিক অতিরিক্ত বৃহৎ আকারের বস্তুর উপস্থিতি প্রয়োজন। 1930 সাল থেকে নিউট্রন নক্ষত্র, কৃষ্ণ গহ্বর (এই নামটা দিয়েছিলেন 1960 সালে মার্কিন পদার্থবিজ্ঞানী জন হুইলার) ইত্যাদির তাত্ত্বিক ধারণা এলেও মোটামুটি গত শতকের সত্তর দশকে পরীক্ষামূলকভাবে এদের উপস্থিতি প্রমাণিত হয়। বোঝা গেছিল, এসব অতিকায় বস্তুর প্রভাবে উৎপন্ন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সৃষ্টি সম্ভব। যদিও পৃথিবীতে পৌঁছালে তার বিস্তার হবে অতি সামান্য, প্রোটনের ব্যাসের মতো। 1974 সালে হালস (R Hulse;1950–) ও টেলার (J Taylor; 1941–) দুটো যমজ নিউট্রন নক্ষত্রের ক্রমহ্রাসমান আবর্তন কাল লক্ষ্য করেন। তাঁরা আপেক্ষিকতা তত্ত্ব থেকে গণনা করে প্রমাণ করেন এই শক্তি হ্রাসের কারণ মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উৎপত্তি। এজন্য তাঁরা 1993 সালে নোবেল পুরস্কার পান। কিন্তু এটাও ছিল মহাকর্ষীয় তরঙ্গের উপস্থিতির পরোক্ষ প্রমাণ। সরাসরি প্রত্যক্ষ প্রমাণের জন্য LIGO (Laser Interferometer Gravitational—Wave Observatory) ওয়াশিংটন ও লুইসিয়ানে পারষ্পরিক 3000 কিমি দূরে দুটো শক্তিশালী ইন্টারফেরোমিটার যন্ত্র বসায় যার সাহায্যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হেতু একটা প্রোটনের ব্যাসের এক সহস্রাংশ দূরত্বের পরিবর্তন পর্যন্ত মাপা যায়। 2015 সালের 14ই সেপ্টেম্বর প্রথম ঐ দুই যন্ত্রে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ 0.2 সেকেন্ড ব্যাপী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পাখির কিচিরমিচির শব্দের আকারে ধরা পড়ে। হিসেবে করে দেখা যায় ঐ তরঙ্গের উৎপত্তির কারণ ছিল 1.3 বিলিয়ন বছর আগে সূর্যের তুলনায় 29 ও 36 গুণ ভারী দুটো কৃষ্ণ গহ্বরের সংঘর্ষ যার ফলে তৈরি হোয়েছিল সূর্যের তুলনায় 62 গুণ ভরের এক কৃষ্ণ গহ্বর। সংঘর্ষের ফলে এই ভর ঘাটতি সৃষ্টি করেছিল ঐ তরঙ্গ (চিত্র নং 3)। ঐ আবিস্কার প্রসঙ্গে ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ব্রুস অ্যালেনের দাবি, 'আইনস্টাইন ভেবেছিলেন মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এত দূর্বল যে তা' সনাক্ত করা সম্ভব নয় এবং তিনি কৃষ্ণগহ্বর সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু (আজ বেঁচে থাকলে) আমার মনে হয় না উনি ভুল প্রমাণিত হবার জন্য কিছু মনে করতেন'।

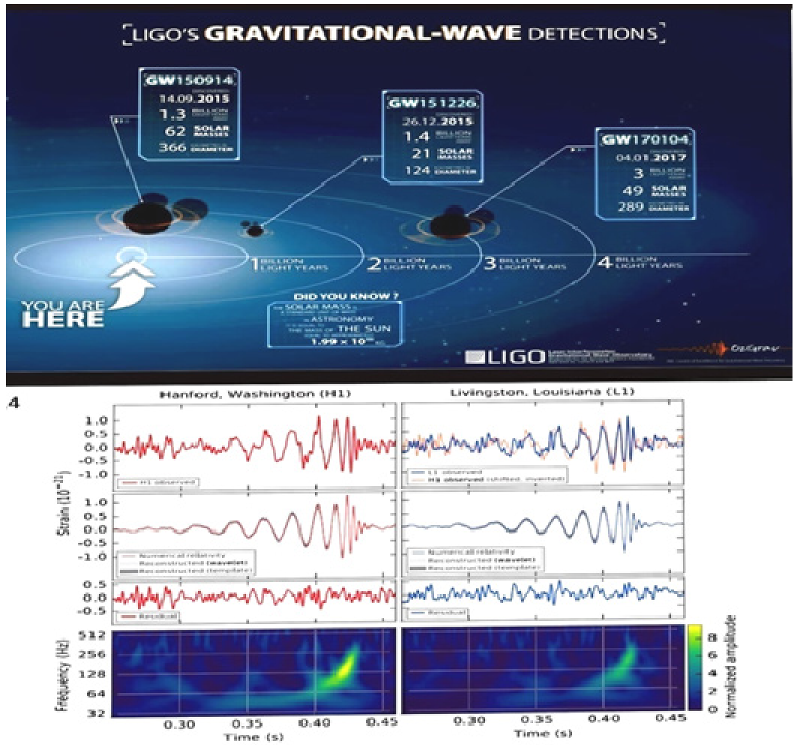

চিত্র নং 3: LIGO এর সাহায্যে যেভাবে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ধরা পড়েছে, তার একটি চিত্রভিত্তিক রূপরেখা

আপেক্ষিকতা তত্ত্বের এক আশ্চর্য ফসল মহাকর্ষীয় তরঙ্গ। অনেকের বিশ্বাস, LIGO- এর ছত্রছায়ায় আরো বেশি ও সুবেদী যন্ত্রের সাহায্যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের মাধ্যমে হয়তোবা কয়েক বিলিয়ন বছর আগের বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম ইতিহাস ভবিষ্যতে জানা যাবে। হয়তো আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের জটিল সমীকরণের মধ্যে এখনো লুকিয়ে আছে এমন অনেক ইঙ্গিত যা মহাবিশ্বের এখনো অজানা অনেক বিস্ময়ের ব্যাখ্যা দেবে। কেননা হকিং–এর ভাষায়, 'বিশ্বের দূরবর্তী সীমান্তে (ঐ তত্ত্বের) প্রভাব আইনস্টাইন যতখানি বুঝেছিলেন তার চাইতেও বেশি আশ্চর্যের'। ◆

*লেখক **ড. অসিত চক্রবর্তী** চাকদহ কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বিজ্ঞান লেখক।*
ইমেল: chakrabarti.asit0@gmail.com

সাপ সম্বন্ধে কিছু কথা

সৌরভ সোম

'সাপ' শব্দটি শুনলেই আমাদের মনে যুগপৎ ভয় ও কৌতূহল জেগে ওঠে। সাপ (snake) কেন নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অথবা সাপের দৃষ্টিশক্তি ভালো না হওয়া সত্ত্বেও সাপ কিভাবে রাতের অন্ধকারে শিকার ধরে কখনো ভেবে দেখেছো? সাপ খোলস ত্যাগ করে কিভাবে বা সাপ ক্রমাগত তার চেরা জিভটি বার করে বাতাসে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে আবার মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় কেন, কখনো ভেবে দেখেছো? সাপ, গিরগিটি, টিকটিকি, কুমির, কচ্ছপ, এরা সকলেই সরীসৃপ (reptile) শ্রেণীভুক্ত মেরুদণ্ডী (vertebrate) প্রাণী (animal)। অন্যান্য সরীসৃপদের চারটি পা থাকলেও সাপের পা নেই কেন জানো কি ?

অন্যান্য সরীসৃপদের মতো সাপেরও সারা দেহ শুষ্ক আঁশ (dry scales) দিয়ে ঢাকা থাকে; এই আঁশগুলি তৈরি হয় ওদের ত্বকের (skin) এপিডার্মিস (epidermis) থেকে । অন্যান্য সরীসৃপদের মতো সাপের ত্বকেও বিটা-কেরাটিন (beta keratin) বলে এক ধরনের প্রোটিন থাকে। সাপের দেহের উষ্ণতা স্থির নয়; পরিবেশের উষ্ণতার সাথে তাল মিলিয়ে ওঠানামা করে। অন্যান্য সরীসৃপদের মতো এরাও ফুসফুসের (lungs) সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় এবং এদের দেহে মেটানেফ্রিক (metanephric) কিডনি রয়েছে। সাপেদের হৃদপিণ্ডে (heart) তিনটি প্রকোষ্ঠ (chamber) [দুটি অলিন্দ (atria) ও একটি নিলয় (ventricle)] থাকে। বেশিরভাগ সাপের দেহে একটিমাত্র কার্যকরী ফুসফুস (lung) থাকে (বাঁ দিকের ফুসফুসটি আয়তনে খুব ছোট হয় বা অনেক প্রজাতির সাপের দেহে থাকে না)। সাপেদের মূত্রথলি (urinary bladder) থাকে না, সেই কারণে এরা আমাদের মত দেহের মধ্যে মূত্র সঞ্চয় করে রাখতে পারে না । দেহ লম্বা এবং সরু হওয়ায় সাপের কিডনি (kidney) দুটি দেহের দুই পাশে একই উচ্চতায় থাকে না; একটি দেহের সামনে থাকে এবং অন্যটি দেহের পিছনে থাকে। সাপ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধে বাড়তে পারে ।

সাপ মাংসাশী কিন্তু আমরা যেমন দাঁত ব্যবহার করে খাবার চিবিয়ে গুঁড়ো করি সাপেরা তা পারে না, তারা তাদের শিকারকে আস্ত গিলে ফেলে । বেশিরভাগ প্রজাতির সাপের করোটিতে (skull) সচল অস্থিসন্ধী (movable joints) থাকায় তারা তাদের মাথার থেকে আকারে অনেক বড় প্রাণীকেও গিলে ফেলতে পারে। সাপের নিচের চোয়ালের অংশ দুটি কেবলমাত্র পেশি এবং ত্বক দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় তারা অনেক বড় হাঁ করতে পারে। সাপের চোখের পাতা (eyelids) থাকে না; এদের চোখ বিশেষ ধরনের স্বচ্ছ (transparent) অনড় (immovable) আঁশ (scale) দিয়ে ঢাকা থাকে যাকে ব্রিল (brille) বলা হয়। ব্রিল স্বচ্ছ হওয়ায় একে আঁশ হিসাবে আলাদা করা বোঝা যায় না কিন্তু

সাপের খোলস ত্যাগের আগে ব্রিল স্বচ্ছ থেকে ঘোলাটে হয়ে যায় এবং চোখের উপর আবরণ হিসাবে দৃশ্যমান হয়। যখন সাপ খোলস ত্যাগ করে তখন ব্রিলটিও তার পুরানো চামড়ার অংশ হিসাবে, দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হয়। ব্রিল সাপের চোখকে ধুলো ও ময়লা থেকে রক্ষা করে এবং এই স্বচ্ছ আঁশ থাকার জন্যই সাপের চোখকে কাঁচের তৈরি বলে মনে হয় । চোখের পাতা না থাকায় এবং অক্ষিগোলক (eyeball) খুব বেশি নড়াচড়া না করার ফলে সাপের চোখ দেখলে মনে হয় সে দীর্ঘ সময় ধরে স্থির দৃষ্টিতে একইভাবে তাকিয়ে রয়েছে। যদিও, বেশিরভাগ সাপেরই দৃষ্টিশক্তি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের তুলনায় ক্ষীণ হয়।

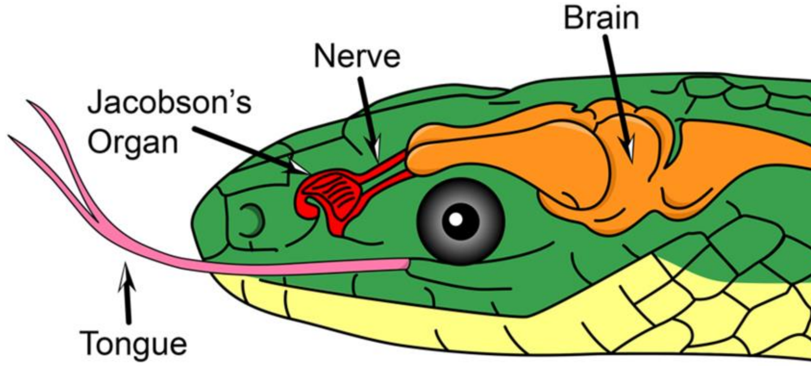

সাপের খোলস ত্যাগ কে মোলটিং (molting) বা একডাইসিস (ecdysis) বলা হয়। একডাইসিসের সময় সাপ তার ত্বকের সম্পূর্ণ বহিঃস্তরটিকে একবারে পরিত্যাগ করে । একটি সাপের খোলস ত্যাগ অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে যথা সাপটির প্রজাতি, বয়স, আবহাওয়া, পরিবেশের তাপমাত্রা, সাপটির ত্বকের এপিডারমিসে ব্যাকটিরিয়া বা পরজীবীর উপস্থিতি, সাপটির স্বাস্থ্য কেমন, পুষ্টিগত দিক থেকে সাপটি কি অবস্থায় আছে ইত্যাদি।

একডাইসিসের ফলে সাপের পুরানো, জীর্ণ ত্বক নতুন ত্বক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং পুরনো ত্বকে বসবাসকারী মাইট (mite) এবং টিকের (tick) মত পরজীবী প্রাণীরা অপসারিত হয়। সাপের খোলস বা পরিত্যক্ত ত্বক ফেরোমোন (pheromone হল এক ধরণের উদ্বায়ী রাসায়নিক পদার্থ যা একই প্রজাতির অন্য প্রাণীদের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে) নিঃসরণ করতে পারে ও যৌন জননের জন্য একই প্রজাতিভুক্ত বিপরীত লিঙ্গের সাপকে আকর্ষণ করে আনতে পারে। একডাইসিসের পরে সাপের নতুন গঠিত ত্বকের রং ও আঁশের প্যাটার্ন উজ্জ্বলতর হয়।

মোলটিং বা একডাইসিস একটি সাপের সারা জীবন ধরেই পর্যায়ক্রমে ঘটে থাকে। প্রত্যেকবার খোলস ত্যাগের আগে সাপটি খাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং প্রায়শই লুকিয়ে থাকে বা নিরাপদ স্থানে চলে যায়। খোলস ত্যাগের ঠিক আগে সাপের ত্বক অনুজ্জ্বল ও শুষ্ক হয়ে যায় এবং সাপের চোখ অস্বচ্ছ বা নীল রঙের হয়ে যায়। সাপের পুরানো, জীর্ণ ত্বকের ভেতরের অংশটি গলে যায়, এবং পুরানো ত্বক ও তার নিচে তৈরি হওয়া নতুন ত্বকের মধ্যে এক ধরনের তরল পদার্থ জমতে থাকে; ফলস্বরূপ ত্বকের পুরানো ও নতুন স্তরদুটি আলাদা হয়ে যায়। কয়েকদিন পরে সাপের চোখ আবার পুনরায় স্বচ্ছ হয়ে যায় এবং সাপটি পুরানো ত্বক থেকে বেরিয়ে আসে যেটি সাপটির মুখের কাছে এসে আলাদা হয়ে যায়। ব্যাপারটা আমাদের পায়ে পরে থাকা মোজা খোলার সঙ্গে তুলনীয়। পা থেকে মোজা খোলার সময় যেমন মোজার ভেতরের অংশটি যেটি আমাদের ত্বকের সংস্পর্শে ছিল (কিন্তু বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিল না) সেটি বাইরে উন্মুক্ত হয়, সাপের খোলস ত্যাগের সময় পুরানো, জীর্ণ ত্বকের ক্ষেত্রেও অনেকটা ওরকমই হয়।

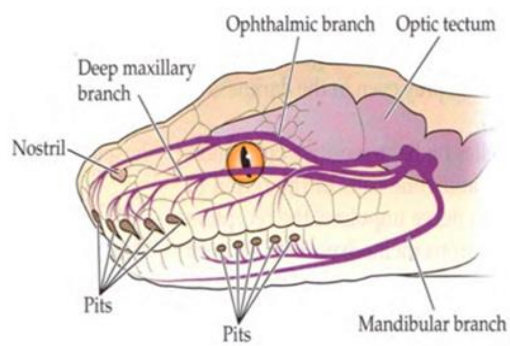

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে একটি সাপ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধে বাড়তে থাকে কিন্তু সাপটির বহিঃত্বক আয়তনে বাড়ে না, সেটি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধে একই থাকায় সাপটির বৃদ্ধি ব্যাহত হয় তাই সে খোলস ত্যাগ করে । ভেবে দেখ, একটি পাঁচ বছর বয়সী শিশু যে গেঞ্জি বা জামা পরে, যখন তার বয়স ১৫ বছর হবে তখন সেই গেঞ্জি

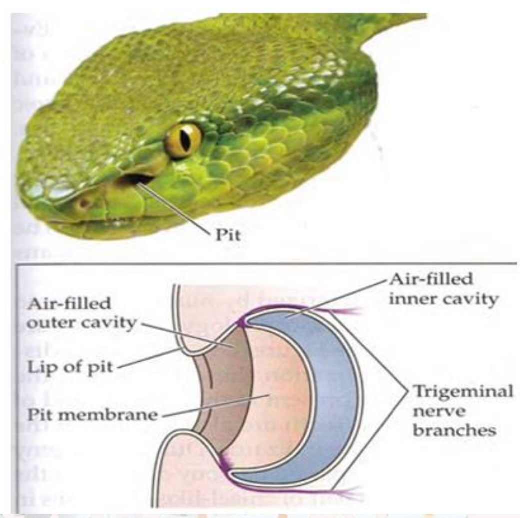

বা জামা তার দেহে মানানসই হবে না, শরীরের পক্ষে ছোট হয়ে যাবে। এর কারণ শিশুটি বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধে বেড়েছে কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে সে যে জামাটি পরতো সেই জামাটি আয়তনে বাড়েনি। কাজেই বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যখন শিশু আয়তনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে ওই পুরনো ছোট সাইজের জামাটি ছেড়ে আয়তনে বড় সাইজের নতুন জামা পরছে। আয়তনে বাড়তে থাকলেও সে যদি পুরনো ছোট সাইজের জামাটি পরে থাকে সেটি তার দেহের সাথে আঁটসাঁট (tight) হবে ও তার বৃদ্ধিকে ব্যাহত করবে। সাপের খোলস ত্যাগ করার পেছনেও কারণটা একই । তফাত হল সাপের নতুন ত্বক সাপের দেহের মধ্যেই পুরনো ত্বকের নিচে তৈরি হয়।

একটি কম বয়সী সাপ যেটি এখনো দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটি বছরের চারবার পর্যন্ত খোলস ত্যাগ করতে পারে। তবে একটি পূর্ণ বয়স্ক সাপ বছরে একবার বা দুবার খোলস ত্যাগ করে।

মানুষের কানের তিনটি অংশ থাকে যথা বাইরের কান বা বহিঃকর্ণ (যেটি মূলত ত্বক ও কার্টিলেজ দিয়ে তৈরি), মধ্যকর্ণ এবং অন্ত:কর্ণ (inner ear)। আমাদের বহিঃকর্ণে টিম্পানিক মেমব্রেন (tympanic membrane) বা ইয়ারড্রাম (eardrum) বলে একটা পাতলা অর্ধস্বচ্ছ পর্দা থাকে যেটি যোগ কলা (connective tissue) দিয়ে তৈরি হয় ও এপিডারমিস (epidermis) দিয়ে ঢাকা থাকে। যখন শব্দতরঙ্গ (sound wave) টিম্পানিক মেমব্রেনে এসে আঘাত করে তখন এই টিম্পানিক মেমব্রেনটি কাঁপতে থাকে এবং টিম্পানিক মেমব্রেনের কম্পনের ফলে মধ্যকর্ণের ক্ষুদ্র হাড়গুলি যেমন মেলিয়াস, ইনকাস এবং স্টেপিস কাঁপে ।

সাপের কোন বহিঃকর্ণ বা টিম্পানিক মেমব্রেন নেই। তবে সাপের অন্তঃকর্ণ আছে এবং 100 থেকে 700 Hertz পরিসীমার শব্দতরঙ্গ সাপেরা বেশ ভালোভাবেই শুনতে পায়। শুধু তাই নয়, সাপেরা মাটির কম্পন খুব ভালো বুঝতে পারে; সাপেদের কানে একটি ক্ষুদ্র হাড় রয়েছে যেটিকে columella বলে। এই হাড়টির সাহায্যে ওরা মাটির মধ্য দিয়ে যে সমস্ত শব্দ তরঙ্গ আসে সেগুলিকে অনুভব করতে পারে। এর ফলে সাপ তার শিকারের চলাফেরা (কোন দিকে যাচ্ছে বা কতটা দ্রুত যাচ্ছে) সহজেই বুঝতে পারে ।

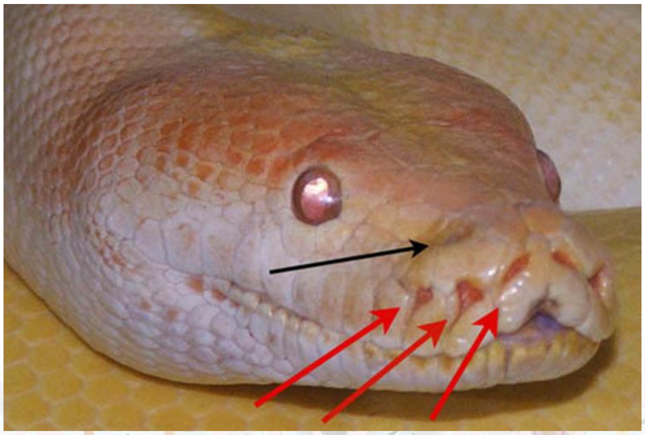

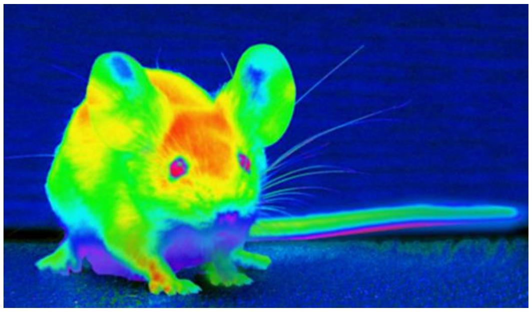

অনেক চতুষ্পদ মেরুদন্ডী প্রাণীদের নাক ছাড়াও একজোড়া অতিরিক্ত ঘ্রাণ গ্রহণ অঙ্গ থাকে যাকে ভোমেরোনেজাল অঙ্গ (vomeronasal organ) বলা হয়। মানুষসহ এপজাতীয় (ape) প্রাণীদের দেহে এই ভোমেরোনেজাল অঙ্গটি কাজ করে না, কিন্তু অন্যান্য অনেক স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে এটি যথেষ্ট কার্যকরী। এই ভোমেরোনেজাল অঙ্গটির মধ্যে প্রচুর সংখ্যায় স্নায়ুকোশ (neuron) থাকে এবং এটির সাহায্যে চতুষ্পদ মেরুদন্ডী প্রাণীরা বাতাসে ফেরোমোন বা অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি অনুভব করতে পারে।

চোখে দেখা এবং কানে শোনা ছাড়াও সাপ দুটি ভোমেরোনেজাল অঙ্গ [ভোমেরোনেজাল অঙ্গের অন্য নাম জ্যাকবসনের অঙ্গ (Jacobson's organ)] ব্যবহার করে বাতাসে উপস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ ইত্যাদি বুঝতে পারে। সাপের মুখগহ্বরের ঠিক উপরে একজোড়া জ্যাকবসনের অঙ্গ রয়েছে। সাপ তার চেরা জিভ বার করে বাতাসে উপস্থিত বিভিন্ন গন্ধদ্রব্যের অণুগুলিকে (odorant molecules) স্পর্শ করে। তারপরে সে তার জিভটি আবার মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় এবং জিভের অক্ষীয় দেশে লেগে থাকা গন্ধদ্রব্যের অণুগুলিকে জ্যাকবসনের অঙ্গদুটির কাছে নিয়ে যায়। জ্যাকবসনের অঙ্গদুটি থেকে গন্ধদ্রব্যের অণুগুলি সম্বন্ধে তথ্য মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় যেখানে গন্ধদ্রব্যের অণুগুলির শনাক্তকরণ হয় । অর্থাৎ সাপ ক্রমাগত জিভ বের করে এবং আবার জিভ ঢুকিয়ে নিয়ে তার জ্যাকবসনের অঙ্গ দুটির মাধ্যমে বাতাসে উপস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের অণু (যেমন শিকারের দেহ থেকে নিঃসৃত উদ্বায়ী পদার্থ বা অন্য সাপের দেহ নিঃসৃত ফেরোমোন) শনাক্ত করতে পারে ।

পাইথন, বোয়া (boa) এবং পিট ভাইপারের (pit viper) [যেমন রাটলস্নেক (rattlesnake)] মাথায় বিশেষ ধরনের তাপগ্রাহী (heat-sensitive) অঙ্গ আছে যাদের পিট অঙ্গ (pit organ) বলা হয়। এই বিশেষ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে সাপ লম্বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ইনফ্রারেড বিকিরণ (long-wavelength infrared radiation যা 5000 থেকে

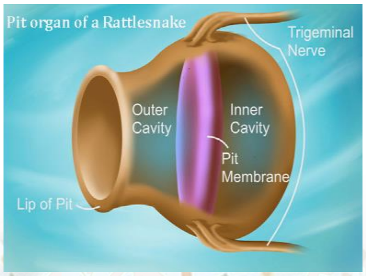

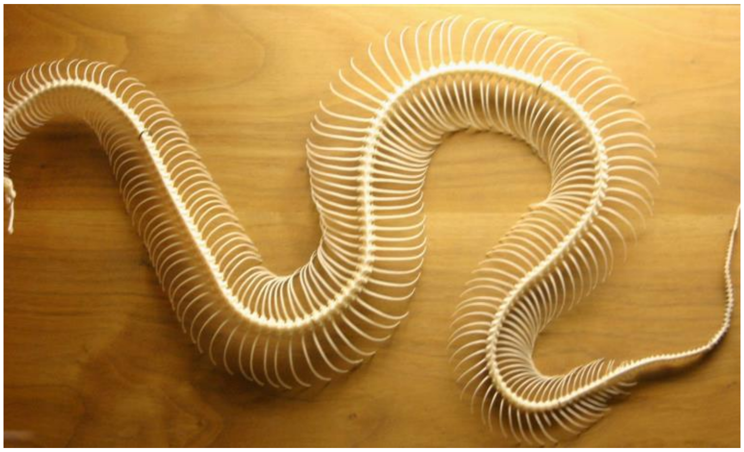

15000 ন্যানোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট হয়) শনাক্ত করতে পারে। উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী যেমন পাখি এবং স্তন্যপায়ীদের (এদের homeotherm বা endotherm বলা হয়) দেহ থেকে বিকীর্ণ তাপ (radiant energy) ওই সব প্রজাতির সাপেরা এই পিট অঙ্গগুলির মাধ্যমে অনুভব করতে পারে । এই পিট অঙ্গগুলির মাধ্যমে সাপ 0.0030 সেলসিয়াস তাপমাত্রার পার্থক্য বুঝতে পারে।

একটি পর্দা পিট অঙ্গটিকে দুটি আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে (chamber) ভাগ করে । ভেতরের প্রকোষ্ঠটির উষ্ণতা সাপের দেহের উষ্ণতার সঙ্গে সমান থাকে। বাইরের প্রকোষ্ঠটি কোন একটি উচ্চ উষ্ণতা সম্পন্ন বস্তু থেকে ইনফ্রারেড আলোর আকারে আগত তাপীয় বিকিরণের সংস্পর্শে এলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তখনই সাপ এই দুটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য বুঝতে পারে।

পিট অঙ্গের পর্দাটিতে তাপ-সংবেদনশীল স্নায়ুকোশ (heat-sensitive neuron) থাকে। পিনহোল ক্যামেরাতে যেমন লেন্স না থাকলেও ঝাপসা এবং কম কনট্রাস্টের কিন্তু চেনা যায় এমন প্রতিবিম্ব তৈরি হয়, পিট অঙ্গগুলিতেও ঠিক তেমনি হয়। ট্রাইজেমিনাল (trigeminal) নার্ভের শাখা (branch) এই পিট অঙ্গগুলিতে আসে এবং এই অঙ্গগুলি থেকে পরিবেশের কোন বস্তু হতে বিকিরিত তাপ সম্বন্ধীয় তথ্য (thermal information) সাপের মস্তিষ্কের অপটিক টেকটামে (optic tectum) বহন করে নিয়ে যায় । এই অপটিক টেকটামে চোখে দেখা দৃশ্য সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণ (processing of visual information) হয় এবং চারপাশের পরিবেশের উষ্ণতা সম্বন্ধীয় তথ্য সাপের চোখের রেটিনায় তৈরি হওয়া প্রতিবিম্বের (visual image) সাথে সুপারইম্পোজড (superimposed) হয় । এর ফলে পাইথন, বোয়া এবং পিট ভাইপার ইত্যাদি সাপগুলির মস্তিষ্কে চোখের মাধ্যমে দেখা ছবির সাথে পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু থেকে নির্গত তাপের তথ্য একত্রিত হয়ে পারিপার্শ্বিকের একটা দৃশ্যমান তাপীয় মানচিত্র (thermal image/thermal map) তৈরি হয় যেটা অনেকটা ইনফ্রারেড ক্যামেরার মাধ্যমে তোলা ছবির মত। ফলস্বরূপ, এই সব সাপগুলি তাদের চারপাশের পৃথিবীকে আলো এবং তাপের মিলিত তথ্যের মাধ্যমে দেখতে পায়; খুব সোজা কথায়, এই সমস্ত সাপগুলি চারপাশের কোন বস্তু থেকে কতটা পরিমাণ তাপ নির্গত হচ্ছে সেটা “দেখতে” পায়। পাখি বা স্তন্যপায়ী প্রাণীরা (যেমন ইঁদুর) উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী হওয়ায় এদের দেহ থেকে বিকীর্ণ তাপের পরিমাণ জড় পদার্থ থেকে নির্গত তাপের পরিমাণের থেকে অনেক বেশি হয়; কাজেই এইসব সাপগুলি পিট অঙ্গগুলির সাহায্যে তাপীয় বিকিরণ শনাক্ত করে রাতের অন্ধকারেও পাখি বা স্তন্যপায়ী প্রাণীদের দেখতে পায় ও তাদের অনুসরণ করে শিকার ধরতে পারে।

বিভিন্ন জীবাশ্ম (fossil) পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে সম্ভবত ক্রিটেশিয়াস (Cretaceous period) যুগে সাপেদের উদ্ভব হয়। উভচর (amphibian), সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী (mammal) প্রাণীদের দেহে দুটি সামনের পা ও দুটি পেছনের পা থাকে। সাপেরদের পূর্বপুরুষ ছিল চতুষ্পদ গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপ এবং প্রাগৈতিহাসিক কালে সাপেদেরও চারটি কার্যকরী পা ছিল । তারপরে আস্তে আস্তে তাদের সামনের দুটো পা লোপ পেল এবং পিছনের পা দুটি ক্রমাগত ছোট হতে থাকলো। বর্তমানে কোন সাপেরই পা নেই যদিও গিরগিটি, টিকটিকি সহ অন্যান্য সরীসৃপদের এখনো চারটে কার্যকরী পা রয়েছে । প্রাগৈতিহাসিক কালের যে সমস্ত সাপের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে তাদের গিরগিটির মতো চারটি পা ছিল কিন্তু বর্তমানে সাপের দেহে pectoral girdle এবং pelvic girdle অনুপস্থিত । Pectoral girdle হল কলার বোন

(collar bone) এবং শোল্ডার ব্লেড (shoulder blade) দিয়ে তৈরি কাঁধের অংশ যেটির থেকে আমদের হাত বেরিয়ে আসে। Pelvic girdle হল অনেকগুলি হাড় দিয়ে তৈরি আমাদের কোমরের অংশ যেখান থেকে পা বেরিয়ে আসে। বোয়া, পাইথন এরকম কয়েকটি সাপের দেহে ক্ষয়প্রাপ্ত গঠন (vestigial structure) হিসেবে pelvic girdle দেখা যায়। বোয়া এবং পাইথনের ক্ষেত্রে ছোট্ট ছোট্ট পেলভিক বা hip bones দেখা যায় এবং এদের ফিমারটি (উরুর হাড়) অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় থাকে।

মানুষ সহ সমস্ত প্রাণীদের দেহগঠনকারী অক্ষগুলি (যথা দেহের মাথা-পা অক্ষ, পিঠ-পেট অক্ষ, ডান-বাম অক্ষ) তৈরি করতে হক্স জিনগুলির (Hox genes) বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। দেহের রূপরেখা (body plan) তৈরি করতে বা দেহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বরাবর কোথায় কোন অঙ্গ তৈরি হবে তা নির্ধারণ করতে হক্স জিনগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে চতুষ্পদ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গা থেকে পাঁজর তৈরি হবে না সামনের পা দুটি তৈরি হবে তা নির্ধারণ করে Hoxc6 এবং Hoxc8 এই দুটো জিন । মেরুদণ্ডের যেখানে এই দুটি জিন একসাথে কাজ করে সেই স্থান থেকে পাঁজর (ribs) তৈরি হয় কিন্তু যে কোশগুলিতে Hoxc6 জিন একা কাজ করে (Hoxc8 কাজ করে না) সেখান থেকে দেহের সামনের পা তৈরি হয়।

দেখা গেছে সাপের ক্ষেত্রে করোটির পিছনের অংশ থেকে শুরু করে দৈর্ঘ্য বরাবর গোটা মেরুদণ্ড জুড়েই Hoxc6 এবং Hoxc8 এই দুটো হক্স জিন একসাথে কাজ করে। এর ফলে সাপের দেহে সামনের পা দুটি তৈরি হয় না, বদলে করোটির পিছনের অংশ থেকে শুরু করে দৈর্ঘ্য বরাবর গোটা মেরুদণ্ড (backbone) জুড়েই পাঁজর তৈরি হয় । মানুষের ক্ষেত্রে মেরুদন্ডটি ৩৩ টি ছোট ছোট হাড় (vertebrae) বা ভারটিব্রি জুড়ে তৈরি হয়। সাপের ক্ষেত্রে মেরুদন্ডে ভারটিব্রির সংখ্যা ৩০০টির বেশিও হতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক কালে সাপেদের তৎকালীন পূর্বপুরুষদের দেহের মধ্যে একটি মিউটেশন (mutation) বা জিনঘটিত পরিবর্তন হয়েছিল তার ফলে Hoxc8 জিনটির প্রকাশস্থান (site of expression অর্থাৎ দেহের যেখানে এটি কাজ করে) মেরুদন্ডের আরও সামনের দিকে এগিয়ে আসে । জিনঘটিত পরিবর্তনের আগে মেরুদণ্ডের ওই জায়গায় Hoxc6 জিনটি একা কাজ করতো । জিনঘটিত পরিবর্তনের ফলে Hoxc8 জিনটির প্রকাশস্থান মেরুদন্ডের আরও সামনের দিকে এগিয়ে আসার ফলস্বরূপ সাপেদের তৎকালীন পূর্বপুরুষদের মেরুদণ্ডের ওই জায়গায় Hoxc6 ও Hoxc8 দুটি জিন একসাথে কাজ করতে শুরু করে। এর ফলে সাপেদের পূর্বপুরুষদের মেরুদণ্ডের ওই স্থানটিতে সামনের দুটি পায়ের পরিবর্তে পাঁজর তৈরি হতে শুরু করে । অর্থাৎ মিউটেশনের জন্য Hoxc8 জিনটি মেরুদণ্ডের কোন জায়গায় কাজ করবে সেটির পরিবর্তন হওয়াতে সাপেদের মধ্যে আর সামনের পা দুটি তৈরি হয় না ।

প্রাণীদের দেহে Sonic Hedgehog নামক একটি জিন (gene) আছে । ক্রোমোজোমের মধ্যে Sonic Hedgehog জিনটির একটি নিয়ন্ত্রক অংশ (control region) বা enhancer রয়েছে যার নাম Zone of Polarizing Activity Regulatory Sequence (ZRS) । Sonic Hedgehog জিনটির এই ZRS enhancer টি চতুষ্পদ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পেছনের পা দুটি তৈরি করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যদি কোন কারণে Sonic Hedgehog জিনটির এই ZRS enhancer বা নিয়ন্ত্রক অংশ কাজ না করে তাহলে Sonic Hedgehog জিনটি থেকে খুব অল্প পরিমাণে প্রোটিন তৈরি হবে এবং চতুষ্পদ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পেছনের পা দুটি খুব ছোট হয়ে যাবে বা তৈরি হবে না।

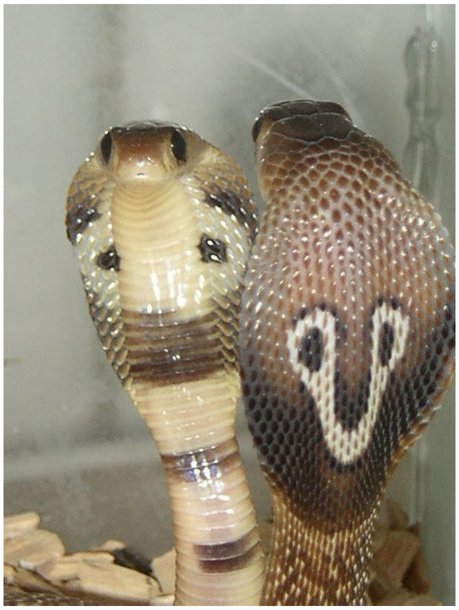

বিজ্ঞানীরা ইঁদুরের মধ্যে Sonic Hedgehog জিনটির এই ZRS enhancer বা নিয়ন্ত্রক অংশটিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে দেখেছেন যে ইঁদুরের পেছনের পা দুটি আর তৈরি হচ্ছে না। সাপেদের ক্ষেত্রে এই Sonic Hedgehog জিনটি থাকলেও জিনঘটিত পরিবর্তনের ফলে তার ZRS enhancer টি নিষ্ক্রিয় থাকে, কাজ করে না। এর ফলে সাপেদের দেহে মেরুদণ্ডের পিছনের অংশে Sonic Hedgehog প্রোটিনটি (যেটি মেরুদণ্ড থেকে পিছনের পা দুটি গঠন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়) খুব কম পরিমাণে তৈরি হয়। ফলস্বরূপ, সাপেদের মধ্যে আর পেছনের পা দুটি গঠিত হয় না ।

আধিপত্য বিস্তারের জন্য এবং স্ত্রী সাপের সঙ্গে প্রজননের সুযোগ পাওয়ার জন্য একই প্রজাতির দুটি পুরুষ সাপ মাঝে মাঝে একে অপরের সাথে লড়াই করে। লড়াইয়ের সময় পুরুষ সাপ দুটি মাটি থেকে উপরের দিকে উঠে দৈর্ঘ্য বরাবর একে অপরকে পেঁচিয়ে ধরে এবং প্রতিপক্ষকে মাটিতে আছড়ে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে। বহু মানুষ দুটি পুরুষ সাপের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের এই লড়াইকে ভুল করে পুরুষ ও স্ত্রী সাপের সঙ্গম নৃত্য (mating dance) বলে থাকেন।

শুনলে অবাক হবে সাপ বা গিরগিটির মতো পাখিরাও কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরীসৃপ যাদের দেহে পালক আছে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে পাখিরা উড়তে সক্ষম এক ধরনের ডাইনোসর (dinosaur) যাদের সামনের পা দুটি ডানায় রূপান্তরিত হয়েছে। আমাদের চারপাশে থাকা বিভিন্ন প্রজাতির পাখিরা প্রত্যেকেই জ্যান্ত ডাইনোসর। ◆

*লেখক **ডঃ সৌরভ সোম** কলকতার ভৈরব গাংগুলি কলেজের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক এবং লোকবিজ্ঞান প্রবন্ধ লেখক।*
ইমেল: sauravshome48@gmail.

বিশ্বমানের গবেষণা যেখানে বাস্তবায়িত

নজরবায়েভ বিশ্ববিদ্যালয়

15 Years Anniversary

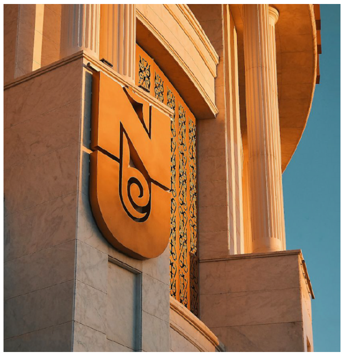

NU-এর অলিন্দ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার অর্থ হল একটি স্বপ্নের উন্মোচন প্রত্যক্ষ করা—একটি বিশ্ববিদ্যালয় যা ইতিমধ্যেই মধ্য এশিয়ায় সেরার সম্মান লাভ করেছে, এখন বিশ্বসেরাদের তালিকায় উঠে আসছে 150,000 তরুণ মনের বিশ্বব্যাপী মিলনস্থল হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে।

নতুন চিন্তাভাবনার জগতে আপনাকে স্বাগতম

ইউরেশিয়ার একেবারে কেন্দ্রস্থলে, যেখানে ইতিহাসের পথে একসময় সিল্ক রোড ধরে একসময় আনাগোনা ছিল পণ্যবোঝাই বণিকের সারির, আজ সেখানে জ্বলে উঠেছে শিক্ষা ও আবিষ্কারের এক আধুনিক আলোকবর্তিকা—নজরবায়েভ বিশ্ববিদ্যালয় (NU)। কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানাতে অবস্থিত এনইউ একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চেয়েও বেশি কিছু; এটি একটি আন্দোলন, একটি ঘোষণা যে মধ্য এশিয়ায় ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণা বিকশিত হতে পারে এবং বিশ্ব মঞ্চে তার দ্যুতি ছড়িয়ে পড়তে পারে। এর সুচনাকশন থেকেই এনইউ অসাধারণত্বের দাবিদার। এখানে ভর্তি সম্পূর্ণরূপে মেধা-ভিত্তিক, কাজাখস্তান এবং তার বাইরের উজ্জ্বলতম মেধাদের এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্যে তাদের নিজেদের স্থান খুঁজে পাওয়া নিশ্চিত করে। দাখিলার প্রথম দিন থেকেই শিক্ষার্থীরা এমন একটি পরিবেশে একাত্ম হয়ে ওঠে যেখানে শিক্ষাদান এবং গবেষণা নির্বিঘ্নে এগিয়ে চলে। অধ্যাপকরা কেবল বক্তৃতা দেন না; তারা কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন, অনুসন্ধানের পথ দেখান এবং শিক্ষার্থীদের আবিষ্কারের প্রাণবন্ত জগতে আমন্ত্রণ জানান।

NU-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা

NU-এর নির্ধারক শক্তি হল গবেষণার উৎকর্ষতার প্রতি এর অটল প্রতিশ্রুতি। এখানে ল্যাবরেটরিগুলি কেবলমাত্র গবেষণার সুযোগ-সুবিধা নয়; এগুলি উদ্ভাবনের উর্বর ক্ষেত্র যেখানে শিক্ষার্থী এবং অনুষদরা একসাথে অজানার অন্বেষণে নিবেদিতপ্রাণ—সে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জৈবপ্রযুক্তি, শক্তি, পরিবেশ বিজ্ঞান, অথবা নীতি অধ্যয়ন—যে ক্ষেত্রই হোক না কেন। গবেষণা স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের জন্য স্থগিত রাখা হয় না; এটি শুরু হয় দাখিলার প্রথম বছর থেকেই। এই চেতনা NU-এর শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক জার্নালে, সহযোগিতামূলক বৈশ্বিক নেটওয়ার্কগুলিতে এবং মানবতার সবচেয়ে জরুরি চ্যালেঞ্জগুলির সমাধানের অগ্রভাগে স্থান দিয়েছে।

অতুলনীয় অনুষদ

প্রতিটি সাফল্যের পেছনে রয়েছে NU-এর অসাধারণ অনুষদ। 57টি দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার পিএইচডি বা এর সর্বোচ্চ বৈশ্বিক সমমানের ডিগ্রিধারীঅধ্যাপকদের নিয়ে NU একটি অতুলনীয় মননশীল সম্প্রদায় তৈরি করেছে। এর 520 জন পুর্ণ-সময়ের অনুষদ, 27 জন পোস্টডক্টরাল গবেষক এবং 48 জন শিক্ষা সহযোগী তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মননশীলতা এবং বিশ্বব্যাপী বৈচিত্র্য উভয়কেই প্রতিফলিত করে। এঁদের অনেকেই পুরস্কার, ফেলোশিপ এবং মর্যাদাপূর্ণ একাডেমির সদস্যপদে ভূষিত, যা NU-তে এমন এক প্রাণবন্ততা নিয়ে আসে যা কেমব্রিজ, পেন, সিঙ্গাপুর, ডিউক, উইসকনসিন এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যের ধারাকে কাজাখস্তানের শৈক্ষিক প্রেক্ষাপটে মিশ্রিত করে।

মধ্য এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম—এখন বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের সফর

টাইমস হায়ার এডুকেশন (THE) ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং 2025-এ, NU গর্বের সাথে মধ্য এশিয়ার #1 বিশ্ববিদ্যালয়ের খেতাব অর্জন করেছে, যা এর উৎকর্ষতা এবং প্রভাবের স্বীকৃতি। এই অগ্রগতি বিশ্বের শিক্ষাজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আরও উল্লেখযোগ্যভাবে NU বিশ্বের শীর্ষ 200 বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তার স্থান অর্জনের জন্য এগিয়ে চলেছে—এটি এমন একটি কৃতিত্ব যা এত কম সময়ের মধ্যে খুব কম প্রতিষ্ঠানই অর্জন করতে পেরেছে। দৃষ্টিভঙ্গি, মেধা এবং জ্ঞানের নিরলস সাধনার মধ্যে দিয়ে মধ্য এশিয়া এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে পারে যা বিশ্বের সেরাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। NU শুরু থেকেই এটা বিশ্বাস করে তা নিশ্চিত করে চলেছে।

একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি: 150,000 আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী

দৃঢ় পদক্ষেপের সূচনা মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় একটি বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে—আগামী তিন বছরে 150,00-এরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীকে স্বাগত জানানো। এই লক্ষ্য কেবল সংখ্যার বিষয়ে নয়; এটি কাজাখস্তানকে শিক্ষার একটি বিশ্বব্যাপী কেন্দ্রে রূপান্তর করার পদক্ষেপ, যেখানে প্রতিটি মহাদেশের শিক্ষার্থীরা একত্রিত হবে, শিক্ষা পাবে এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে। এটি করার মাধ্যমে, NU কেবল শ্রেণীকক্ষকে চার দেওয়ালে আবদ্ধ রাখতে চায় না বরং সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ধারণার মধ্যেও সেতুবন্ধন করতে চায়।

ভবিষ্যৎ গড়ার প্রতিষ্ঠান

NU-এর শৈক্ষিক প্রশস্ততা নিশ্চিত করে যে প্রতিটি শিক্ষার্থী উন্নতির জন্য একটি জায়গা খুঁজে পায়:

- ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডিজিটাল বিজ্ঞান, যেখানে উদ্ভাবনের সাথে মননশীলতা মিলিত হয়।
- বিজ্ঞান এবং মানবিকতা, যেখানে আবিষ্কার কল্পনার ভাষায় কথা বলে।
- চিকিৎসা, যেখানে বিজ্ঞান সহানুভূতির ভাষায় কথা বলে।
- খনি এবং ভূ-বিজ্ঞান, যেখানে স্থায়িত্ব ঐতিহ্যের সাথে মিলিত হয়।
- ব্যবসা, শিক্ষা এবং জননীতি স্নাতক স্কুল, যেখানে ভবিষ্যতের জন্য নেতৃত্ব তৈরি করা হয়।
- প্রস্তুতিমূলক অধ্যয়ন কেন্দ্র, যেখানে লুকানো সম্ভাবনাকে উজ্জ্বলতায় পরিমার্জিত করা হয়।

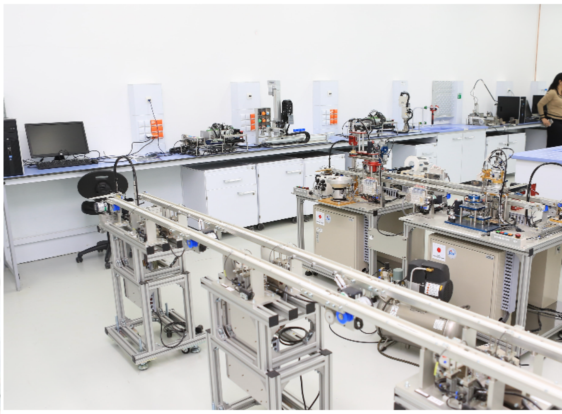

ভবিষ্যতের পথ

2018-2030 সালের পরিকল্পনা দ্বারা পরিচালিত NU কেবল কাজাখস্তানের জন্য নয়, বরং বিশ্বের জন্য মানদণ্ড স্থাপন করে চলেছে। 2025 সালের মধ্যে এটি তার ছাত্র সংখ্যাকে 8,000-এ উন্নীত করার লক্ষ্য রাখে, একই সাথে অংশীদারিত্ব, অনলাইন উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিকীকরণের জন্য সাহসী প্রচেষ্টার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী তার ব্যাপ্তিকে প্রসারিত করে।

HAPPY PUJO

www.nu.edu.kz

NAZARBAYEV UNIVERSITY

ASTANA, KAZAKHSTAN

BA | BS | MBBS | BTECH
MA | MS | MBA | MD | MTECH
PhD | Post Doctoral

TIMES & QS RANKINGS

#1 UNIVERSITY IN CENTRAL ASIA

S&N SOLUTIONS
UG 17 JYOTI SHIKHAR DISTRICT CENTER,
JANAKPURI, NEW DELHI 110 058 INDIA
E: info@snsols.com | M: +91 9811103745